সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নভেম্বর ২০১৪

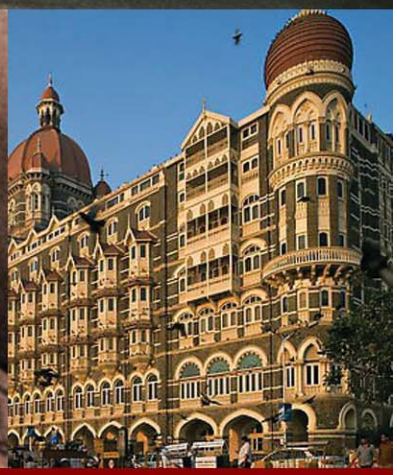

প্রাচীন সভ্যতার মুখোমুখি...

২ নভেম্বর ২০১৪ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইটিইসি এবং আইসিসিআর দিবস সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ

২৬ নভেম্বর ২০১৪ কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী

২৪ নভেম্বর ২০১৪ কাঠমান্ডুতে সার্ক স্থায়ী কমিটির ৪১তম বৈঠকে সার্কভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্র সচিববৃন্দ

২৫ নভেম্বর ২০১৪ নয়াদিলিস্নতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাংলাদেশের সংসদ সদস্য ও নীতিনির্ধারকদলের বৈঠক

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঢাকার ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রীপঙ্কজ সরন

১১ নভেম্বর ২০১৪ ভূটানইন্ডিয়া-নেপাল এসোসিয়েশন (বিআইএনএ)এর মিশন প্রধানদের সংশিষ্ট সীমান্ত পরিদর্শন

২৭ নভেম্বর ২০১৪ ঢাকায় বেঙ্গল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

১৪ নভেম্বর ২০১৪ শাহবাগে জাতীয় জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে *তোমার অসীমে*

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ বিয়াল্লিশ | সংখ্যা ১০ | কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২১ | নভেম্বর ২০১৪

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের Facebook page: /HighCommissionofIndiaDhaka
লাইক ও ভিজিট করুন ভারত বিচিত্রা Facebook page: /BharatBichitra; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Igcc Dhaka, Follow us on twitter /ihcdhaka

স্মৃতিময় আট দিন

প্রাচীন সভ্যতার মুখোমুখি

সূচিপত্র

বাঘা যতীন অগ্নিযুগের অমর শহীদ ০৪
ঢাকায় ভারত ও বাংলাদেশের হাই কমিশনারদের সম্মেলন ০৮
স্মৃতিময় আট দিন ১১
ছোটগল্প: নিজের ঘর ১৪
হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে কিছু সময় ১৯
কবিতা ২৪
প্রাচীন সভ্যতার মুখোমুখি ২৬
পাঁচ দিনে দিল্লি জয়! ২৯
ধারাবাহিক: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৩
টাটা শিল্পসা স্রাজ্য: অতীত ও বর্তমান ৩৮
ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৪০
ছোটগল্প: রক্তমাংস এবং নারীমূর্তি ৪১
অনুবাদ গল্প: পয়সা বেঁচে গেল ৪৪
শেষ পাতা: বুদ্ধদেব বসু ৪৮

পাঁচ দিনে দিল্লি জয়!

মিউজিকের কল্যাণে গত দু'বছরে বিভিন্ন উৎসবে অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। ইন্ডিয়া মিউজিক উইক্সএ অংশ নি তে ভারতে গিয়েছি ২০১২ সালে, জাফনা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে শ্রীলংকায় গিয়েছি, গিয়েছি বিশ্বের সবচেয়ে শান্তির দেশ নরওয়ের ছ'টি শহরে গান গাইতে। দেশকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার এ প্রচেষ্টায় এই পর্যন্তই যথেষ্ট খুশি এবং অনুপ্রাণিত ছিলাম আমরা। কিন্তু বছর শেষে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মৃদু পবন দাসের একটি ফোন *চিরকুটকে*: 'আমরা এ বছর সাউথ এশিয়ান ব্যান্ড ফেস্টিভ্যালে আপনাদের পাঠাতে চাই, আপনারা কি যেতে পারবেন?' এই পর্যন্ত শুনে খুশিতে মনে মনে তিন লাফ দিতে না দিতেই ওপাশ থেকে স্বভাবসুলভ বিনয়ী ভঙ্গিতে তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'সরি আপনাদের জানাতে দেরি করে ফেললাম... শুধু তাই নয়, আপ নাদের ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মানার্থে আরও একটি বিশেষ কনসার্ট করতে হবে'। আনন্দে শুধু লাফ নয়, এবার রীতিমত ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার মত অবস্থা!

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮০২৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ...

ভারত বিচিত্রার এপ্রিল ২০১৪ সংখ্যায় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপর একটি প্রতিবেদনে ভারতীয় লেখক জ্যোতির্ময় দাশ এমন কিছু নতুন তথ্য জানিয়েছেন যা সত্যিই আমাদের অগোচর ছিল। মূলত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় যে সব রাজনৈতিক নেতা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না তাদের দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসীদের সঙ্গে সহাবস্থান নিয়ে একটা দ্বিধা ছিল। হিন্দু স্তান্নপাকি স্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু ও মুসলমানদের তাদের পছন্দমত দেশে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। মুসলমানদের যেমন পাকিস্তানে চলে যাবার প্রবণতা ছিল, তেমনি ছিল হিন্দুদের হিন্দুস্তানে চলে যাওয়ার। স্বাধীনতার জন্য লালায়িত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিলাতের প্রভুদের চশমায় দেখা তথাকথিত গণতন্ত্রের যুক্তি জনগণের কাছে অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য মনে হল। জনগণ সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রাধান্য দিল। পঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ নিয়ে জটিলতা দেখা দিল। মুসলিম লীগের ড. মালেক ও কংগ্রেসের পক্ষে ক্ষিতীশ নিয়োগী সীমানা নির্ধারণে একমত না হতে পারায় স্যার র‌্যাডক্লিফ একাই তাঁর ইচ্ছামত সীমানা নির্ধারণ করলেন আর হিন্দু ও মুসলমান ১৪ আগস্টে তাঁর বাঁশির হুইসেল শুনেই দখলি রাজনীতি ও খুনোখুনি শুরু করে দিল।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতা শহরে মুসলিম লীগ আহুত ডাইরেক্ট এ্যাকশন্ এর পরিণতি এবং নোয়াখালি, বিহার, লাহোর ও ডেরা ইসমাইল খানে তার প্রতিক্রিয়া রাজনীতিবিদদের সামনে অশনিসংকেতের মত হয়ে দেখা দিল। ১৪১৫ আগ স্টের ছুঁড়ে দেওয়া জ্যাচু ্যত বাণকে আর ফিরিয়ে আনা গেল না। শুধু তাই নয়, দেশীয় রাজ্যগুলির পাকিস্তান্নহি ন্দুস্তানে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়ে রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেল, যার সাক্ষী আজও কাশ্মীর।

এই যখন পরিস্থিতি তখন পাকিস্তানের গণপরিষদে কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না বললেন, 'এখন থেকে পাকিস্তানের মুসলমান, হিন্দু ও অন্যান্য জাতি হবে এক পাকিস্তানী জাতি।' এই আশ্বাসের ফলে ধীরেন দত্তরা 'মুসলিমবিদ্বেষী' বলে যে প্রচার এতদিন দ্বিজাতিতত্ত্বের দাবিদার মুসলিম লীগ করে আসছিল তার অবসানে ব্রতী হলেন।

এই সন্ধিক্ষণে ধীরেন দত্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাকিস্তান গণপরিষদে তুললেন। কতিপয় কংগ্রেস সদস্য ছাড়া কোন মুসলমান সদস্য এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও বহুভাষাবিদ পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবির প্রতি জোর সমর্থন জানালেন। ফলে পাকিস্তানের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে 'ভারতের দালাল' বলে আখ্যায়িত করলেন। আর করবেন নাই বা কেন? যেখানে কায়দে আজম উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেখানে সংখ্যালঘু এক বাঙালি হিন্দু রাজনীতিকের এতবড় দুঃসাহস কি সহ্য করা যায়? গাত্রদাহের আরও কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ছাত্রজনত্মা বুদ্ধিজীবীরাজ নৈতিক নেতৃবৃন্দ কায়দে আজমের 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বক্তব্যকে তীব্র ধিক্কারে প্রত্যাখ্যান করলেন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের আত্মাহুতিতে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল। মাতৃভাষার জন্য বিশ্বের আর কেউ কোথাও প্রাণ দেয়নি। এই আন্দোলনে ভারতের সংশ্লিষ্টতার অজুহাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫৩ সালে পাসপোর্টভিসার প্র বর্তন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্বপাকি স্তান ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগবিরোধী শেরে বাংলা, মাওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দি, শেখ মুজিব, মানিক মিয়ার যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফণীভূষণ মুজমদার, গৌর চন্দ্র বালা, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যুক্ত হন। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পাকিস্তানে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। কলকাতায় নেতাজী সুভাষ বসুর এলগিন রোডের বাড়িতে পুরনো বন্ধুদের দেওয়া সংবর্ধনার জবাবে শেরে বাংলার 'আমি ভাগাভাগি বুঝি না, আমার দুই বাংলার মানুষ দুটা পেট ভরে খেতে পাক এবং সুখেশা ন্তিতে থাকুক' বক্তব্যের সূত্র ধরে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ক ধারা জারি করে শেরে বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে। কিন্তু যুক্ত নির্বাচন প্রথায় পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জোরাল হয়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী শেরে বাংলাকে সঙ্গে নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সেই মন্ত্রিসভায় শেরে বাংলাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেসের কামিনীকুমার দত্তকে আইনমন্ত্রী করা হয়। কামিনীকুমার ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করেন। সেই সংবিধানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুইং রেজির সঙ্গে বাংলাভাষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

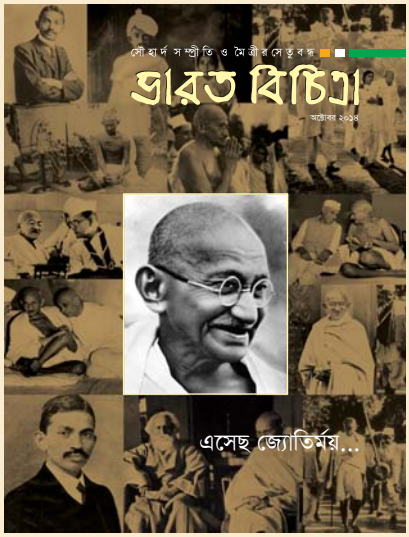

আইউব খান ক্ষমতায় এসে '৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করে '৬০ সালে নতুন সংবিধান রচনা করে নির্বাচন দেন। তিনি জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দিতে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। তার পরের ইতিহাসের পুনরুক্তি করতে চাই না। শুধু বলব, পাকিস্তানের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মূলত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সালাম্বরকতরফিক প্র মুখের আত্মাহুতির ফলশ্রুতি ও বাস্তবধর্মী সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারাবাহিকতার সার্থক ফসল বাংলাদেশ। একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠ দলিল। কাজেই শহীদ ধীরেন দত্তের সেই দর্শনের সূত্র ধরেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান এবং ২ লাখ মা বোনের সম্ভ্রমহানির মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।

'৭১ সালে পাক হানাদাররা তাঁকে যে নির্যাতন করে তার বিবরণ রমনী শীল নামে একজন ক্ষৌরকারের কাছ থেকে জানা যায়। তাঁর হাঁটু দু'টি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি হামাগুড়ি দিয়ে মলমূ ত্র ত্যাগ করতে যেতেন। তবু তিনি নতি স্বীকার করেননি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'– ধীরেন দত্ত সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশে ধীরেন দত্তের নামে কোন স্মৃতি স্মারক নেই। এ ব্যাপারে আমি মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অসংখ্য শহীদের সঙ্গে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দূরদর্শী চিন্তানায়ককে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

সমীররঞ্জন শীল
আনন্দ নিকেতন, নিকেতন আ/এ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে, পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে... দেখতে দেখতে শীত এসে গেল মৃদু পদসঞ্চারে আমাদের আটপৌরে বাংলা ঘরে। কুয়াশার চাদরে মুখ ঢেকে আলসে ছেলের মত সুয্যিমামা দেরি করে ঘুম থেকে উঠছেন ইদানীং। ফলে আমাদের নদীমাতৃক দেশে নৌচলাচলে সমূহ বিঘ্ন ঘটতে শুরু করেছে। পত্রপত্রিকার সে সব খবরে আমাদের নাগরিকমন কতটা বিচলিত হয় জানি না, কিন্তু এর জন্যে বহু মানুষ বিড়ম্বিত হচ্ছেন, বিচলিত হচ্ছেন সন্দেহ নেই। সেই সব দুর্যোগ ও দুর্ভাগ্যকবলিত মানুষের সার্বিক মঙ্গল কামনায় আমাদের প্রার্থনা কায়মনোবাক্যে।

শহরে মানুষের জীবনে শীত বিলাসিতার ঋতু– দেশভ্রমণের জন্যে অতীব প্রশস্ত। এই শীতে আপনি বহু ব্যয় করে, বহু দূরের মহাদেশ ঘুরে আসতে পারেন কিন্তু আমি বলব, আপনি ঘুরে আসুন আপনার নিকটতম প্রতিবেশী দেশটিই। একই সন্নিহিত ভূখণ্ডের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত দেশটি, প্রকৃতপ্রস্তাবে উপমহাদেশটি শীতের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমাদের বৃহৎ পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ ভারতবর্ষ নামের মহাদেশখণ্ডে আপনি সবই পাবেন– এ এক আশ্চর্য সব পেয়েছির দেশ– পাহাড়পর্বত, নদী নালা, দিগন্ত বিস্তারিত সমুদ্রসৈকত, ধবল তুষার, অঝোর ঝর্নাধারা, ঊষর মরুভূমি– সবই আপনাত্র দেখবার অপেক্ষায়।

আর ইতিহাস যদি আপনার প্রিয় বিষয় হয়ে থাকে, কিংবা প্রাচীনতা যদি আপনাকে আকৃষ্ট করে, তবে ভারতবর্ষই আপনার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। কারণ পৃথিবীর একমাত্র বিদ্যমান প্রাচীন সভ্যতাটি আপনি প্রত্যক্ষ করবেন এখানেই। আমি নিশ্চিত, আপনি দিব্যজ্ঞানে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন স্তোত্র শুনতে পাবেন গিরিখাতের স্তব্ধতায়, বিসর্পিল সমুদ্রসৈকতের ফেনায়িত তরঙ্গবি ক্ষোভের মুহূর্মুহু গর্জনে, বনস্থলীর সকরুণ মর্মরধ্বনিনিচয়ে। বৃন্দাবনের পথে পথে শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণরেখা হয়তো মুছে গেছে কিন্তু উরুবেলায় নিরঞ্জন নদীটির তীরে আপনি পরম কারুণিক ভগবান বুদ্ধের সমূহ উপস্থিতি অনুভব করবেন। এই প্রাচীন সভ্যতার মুখোমুখি হয়ে আপনি নিশ্চয় উদ্বেলিত হয়ে উঠবেন। আপনি গর্বিত হবেন এই কথা ভেবে যে, এই সভ্যতার পরম্পরা আপনাতেও সঞ্চারিত। আপনার ধমনিতেও সেই কল্লোলিত মহাকালের, সেই প্রাচীন সভ্যতার অনুরণন আপনি অনুভব করতে পারবেন।

শুধু কি প্রাচীন সভ্যতা? মধ্যযুগের উজ্জ্বল নিদর্শন সেখানে এতটাই প্রকট যে, মনে হবে কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল তাজমহলের মর্মরগাঁথা বুঝি কথা বলে উঠল! আপনি আজমিরের দরগায় ইচ্ছে পূরণের মানত করতে পারেন– আপনার মনস্কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। সব গুহ্য কথা বলতে হয় না, তবু একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের মধ্যমাকন্যা এক বস্তা টাকার প্রার্থনা করেছিল সেখানে। কিছুদিন পরে তার পিতা আক্ষরিক অর্থেই এক বস্তা টাকা পেয়েছিলেন তাঁর প্রকাশকের কাছ থেকে। এরপর থেকে নাকি তিনি সত্যিই লেখার জন্য বস্তা বস্তা টাকা পেতে থাকেন। এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

ঢাকায় সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের হাই কমিশনারদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের জোর তাগিদ এসেছে। ভারত ও বাংলাদেশের সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন দীর্ঘজীবী হোক।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাঘা যতীন

অগ্নিযুগের অমর শহীদ

শাহরিয়ার কবির

ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন, এই সংগ্রামে যাঁদের আত্মদান ইংরেজ শাসকদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে, দুশোবছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তিমূলে আঘাত করে স্বাধীনতা অনিবার্য করে তুলেছে– তাঁদের অন্যতম বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯১৯১৫), যিনি 'বাঘা যতীন' নামে সমধিক পরিচিত। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভালবাসা ও দায়বদ্ধতা, অপরিসীম সাহস ও শৌর্যবীর্য তাঁকে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে স্থান দিয়েছে। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালাশোরের কপ্তিপোদায় ইংরেজ বাহিনির সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন তিনি। অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা মরব, দেশ জাগবে'।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রায়ান্ধকার মঞ্চের পাদপ্রদীপের নীচে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ছিল নাটকীয় এবং সময় ছিল প্রতিকূল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে গত শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে দু'টি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি নরমপন্থী, কখনও বা আপসকামী; অন্যটি চরমপন্থী ও বিপ্লবী এবং এই উভয়ধারাই মূর্ত ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে। বিপ্লবীরা *অনুশীলন*, *যুগান্তর* প্রভৃতি দলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও এসব দলের বহু নেতাকর্মী একই সঙ্গে কংগ্রেসেরও নেতাকর্মী ছিলেন।

কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব বিশ্বাস করতেন ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আইন সভা ও ব্যবস্থাপক সভায় নিজেদের জন্য আসন সংখ্যা বাড়িয়ে আবেদননিবেদন করে

কপ্তিপোদা গ্রামের এই স্থানে ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বাঘা যতীন ও তাঁর সহযোদ্ধারা ইংরেজ বাহিনির সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে আহত হন

বালাশোরের কপ্তিপোদা গ্রামে বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীরা এখানে আত্মগোপন করে ছিলেন

কিছু সংস্কারমূলক দাবি আদায় এবং সীমিত পরিমাণে স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে। চরমপন্থী বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করায় বিশ্বাস করতেন। প্রথম পর্যায়ে তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন ডাকাতি করে অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের পথ, দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজেরা বোমা বানিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের কুখ্যাত ব্যক্তিদের ওপর হামলা চালিয়েছেন, যার হাত থেকে স্বয়ং ভাইসরয়ও রেহাই পাননি। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই অগ্নিগর্ভ পর্বের সিংহভাগ দখল করে রেখেছিলেন বাংলার বিপ্লবীরা। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী থেকে আরম্ভ করে বাঘা যতীন, প্রীতিলতা, সূর্য সেন পর্যন্ত শত শত বিপ্লবীর আত্মদান শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকেই অনিবার্য করে তোলেনি, একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অপরাপর উপনিবেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকেও অনুপ্রাণিত করেছে।

দুই.

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মেছিলেন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে। তাঁদের পৈত্রিক বাড়ি ঝিনাইদহের রিষখালীর সাধুহাটিতে। যতীন্দ্রনাথের পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মা শরৎশশী দেবী পিতৃগৃহে থেকে তাঁকে লালনপালন করেন। স্থানীয় স্কুল থেকে ১৮৯৫এ এন্ট্রান্স পাশ করে যতীন্দ্রনাথ কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজে (বর্তমানে ক্ষুদিরাম কলেজ) মানবিক বিদ্যার পাশাপাশি সাচিবিক শিক্ষা লাভ করেন। কলকাতায় ছাত্রজীবনেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতা, স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। বিবেকানন্দের প্রেরণায় তিনি তরুণদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দেশমাতৃকা ও মানবসেবায় সংগঠিত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

গোপন বিপ্লবী কাজের সুবিধার জন্য তিনি একজন ব্রিটিশ আইনজীবী ও সাময়িকপত্র সম্পাদকের সহকারী হিসেবে কাজ শুরম্ন করেন যিনি ভারতবর্ষীয়দের সমৱঅধিকার ও সমৱমর্যাদায় বিশ্বাস করতেন। ১৯০০ সালে কলকাতায় যাঁদের উপস্থিতিতে *অনুশীলন সমিতি* নামে গোপন বিপ্লবী সংগঠন গঠিত হয়, যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি কুষ্টিয়া, যশোর ও নদীয়ায় *অনুশীলন সমিতি* গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

একই বছর যতীন্দ্রনাথ কুমারখালীর ইন্দুবালা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। তাঁদের চার সন্তানের ভেতর অতীন্দ্র (১৯০৩১৯০৬) শৈশবে মারা যান। অন্য তিন সন্তান আশালতা (১৯০৭ '৭৬), তেজেন্দ্র (১৯০৯ '৮৯) এবং বীরেন্দ্র (১৯১৩ '৯১) পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তেজেন্দ্রনাথের পুত্র পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্তমানে প্যারিসে থাকেন, যাঁকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০১৩ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী পদক' প্রদান করা হয়েছে। তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় তাঁর পিতামহের ওপর প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৯০৬ সালে প্রথম সন্তানের অকালমৃত্যুর পর স্ত্রীকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ হরিদ্বারে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে তিনি জানতে পারেন গ্রামে এক বাঘের আবির্ভাব হয়েছে। গ্রামবাসীকে বাঘের হামলা থেকে রক্ষার জন্য তিনি কয়েকজন তরুণকে নিয়ে জঙ্গল ঘিরে ফেলেন। গ্রামের লোকদের ধারণা ছিল ছোটখাট চিতাবাঘ হবে। ঘেরাওয়ের ফলে জঙ্গলের ভেতর থেকে যখন বাঘ বেরিয়ে আসে, দেখা গেল সেটি সুন্দরবনের ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। যতীন্দ্রনাথ একটি নেপালি ছুরি নিয়ে বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাঘের সঙ্গে রীতিমত মল্লযুদ্ধ করে যখন সেটিকে হত্যা করেন তখন বাঘের আঁচড় ও কামড়ে তাঁর জীবন অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। দ্রুত তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা পাঠানো হয়। হাসপাতালের সার্জন লে. কর্নেল সুরেশ সর্বাধিকারী তাঁর প্রাণশক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর সুচিকিৎসার কারণে শরীরে তিনশো ক্ষত নিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

ডা. সর্বাধিকারী তাঁর বীরত্বের কথা একটি দৈনিকে লেখার পর সরকার তাঁকে সাহসিকতার জন্য রূপোর শিল্ড প্রদান করে, যেখানে যতীন্দ্রনাথের বাঘ হত্যার ছবি খোদাই করা ছিল। এরপর থেকে তিনি 'বাঘা যতীন' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯০৩ সালে ঢাকায় *অনুশীলন সমিতির* এক সভায় বাঘা যতীন সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন। *অনুশীলন সমিতি* ছিল তরুণদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করবার গণসংগঠন। বিভিন্ন এলাকায় ক্লাব, শরীরচর্চা কেন্দ্র, পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তরুণদের সংগঠিত করা এবং বিভিন্ন ধরনের জনসেবামূলক কাজে তাদের আগ্রহী করে তোলা ছিল সমিতির উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সময়ে বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কবলিত এলাকায় সেবামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করেন। শ্রী অরবিন্দ *অনুশীলন সমিতির* সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ নেতৃকর্মীদের সমন্বয়ে ১৯০৫ সালে *যুগান্তর দল* গঠন এবং দলের অন্যতম সংগঠক হিসেবে বাঘা যতীনকে নির্বাচন করেন। ১৯০৮ সালে আলীপুর বোমা মামলায় শ্রী অরবিন্দসহ সংগঠনের অধিকাংশ নেতা গ্রেফতার হলে যতীন্দ্রনাথ *যুগান্তর দলের* মূল নেতৃত্বে আসেন। মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির স্থাপন ও প্রশিক্ষণের জন্য তিনি বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর জমি কিনেছিলেন। *অনুশীলন, যুগান্তর* প্রভৃতি দলের অর্থ ও অস্ত্রের প্রধান উৎস ছিল ডাকাতি, যা স্বদেশী ডাকাতি নামে পরিচিত ছিল। সমাজের বেশ কিছু বিত্তবান ব্যক্তিও এসব সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন।

ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের মূল নেতৃত্বে তখন যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। সে সময়ে *যুগান্তর*এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র পালের *বন্দে মাতরম*

উড়িষ্যার বালাশোর কারাগারের ফাঁসির মঞ্চ– নরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনকে এখানে ১৯১৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ফাঁসি দেওয়া হয়

বালাশোরের সামরিক হাসপাতাল– এখানেই বাঘা যতীন অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে লেখালেখি শুরু করেন। তিনি যদিও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন তারপরও কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থেকেই কাজ করতেন। যতীন্দ্রনাথ তরুণদের সামরিক বাহিনিতে যোগদানে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরই উৎসাহে মানবেন্দ্রনাথ রায় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রবাসী ভারতীয়দের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত করেছিলেন।

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়াশিবপুর ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন্দ্রনাথ প্রথম গ্রেফতার হন। তাঁদের দলের আরও ৪৭জন এই মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। সেই সময় বেশ কয়েকজন ইংরেজ এবং এ দেশীয় সরকারি কর্মকর্তা বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। এক বছর কারাবাসের পর মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ না থাকায় যতীন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করেন। এরপর তিনি বিচ্ছিন্ন হত্যার পথ পরিহার করে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানির যুবরাজ ভারত সফরে এলে যতীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সাহায্যের অনুরোধ জানান। তাঁর প্রস্তাবে জার্মান যুবরাজ সম্মত হন। তবে অস্ত্র পাঠানোর আগেই ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হলেও জার্মান যুবরাজ যতীন্দ্রনাথকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য তিন জাহাজ অস্ত্র পাঠিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার বিষয়টি জানতে পেরে জার্মান জাহাজ তিনটি মাঝপথে দখল করে নেয়। ঠিক হয়েছিল, সুন্দরবনে যতীন্দ্রনাথদের ঘাঁটির কাছে এই অস্ত্রের জাহাজ নোঙর করবে।

পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় যতীন্দ্রনাথকে কলকাতা ছেড়ে উড়িষ্যায় যেতে হয়। উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর কাছে বালাশোরে তাঁদের একটি আস্তানা ছিল। ইংরেজদের কাছে এই তথ্যটিও পৌঁছে যায়। তারা বাঘা যতীন এবং তাঁর সহযোগীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ ও নিয়মিত সৈন্যদের যৌথ বাহিনি পাঠায়। এলাকায় প্রচার করা হয় যে, পুলিশ পাঁচজনের এক দুর্ধর্ষ বাঙালি ডাকাতদলকে গ্রেফতার করতে এসেছে। ইংরেজদের এই প্রচারের ফলে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের লোকালয় ত্যাগ করতে হয়। এক পর্যায়ে পাহাড়েজ ঙ্গলে না পালিয়ে ইংরেজ বাহিনির মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যতীন্দ্রনাথ। সঙ্গীদের তিনি বলেন, এ যুদ্ধে তাঁরা হয়তো জয়ী হবেন না, তবে তাঁদের মৃত্যু শতসহস্র তরুণকে মাতৃভূমির জন্য আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বুড়িবালাম নদীর কাছে কপ্তিপোদা গ্রামে পাঁচ বিপ্লবী ইংরেজ যৌথবাহিনিকে প্রতিরোধের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেন। ইংরেজ বাহিনির কাছে দূরপাল্লার রাইফেল, বন্দুক থাকলেও বাঘা যতীনদের কাছে ছিল শুধু মাউজার পিস্তল। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মাত্র দু'ঘণ্টার অসমযুদ্ধে বাঘা যতীনের সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী যুদ্ধস্থলে শহীদ হন। বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গী জ্যোতিষ গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। দলের অপর দুই সদস্য মনোরঞ্জন ও নীরেন পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে ধরা পড়েন। প্রতিপক্ষের বহু হতাহত হলেও সরকারিভাবে তা কখনও প্রকাশ করা হয়নি। পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর বালাশোরের সামরিক হাসপাতালে বাঘা যতীন মৃত্যুবরণ করেন। সরকার তাঁর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর না করে দ্রুত শেষকৃত্য সম্পন্ন করে– যে কারণে বাঘা যতীনের স্ত্রী পরবর্তী ১২ বছর বিশ্বাস করেননি তাঁর স্বামী বালাশোরে শহীদ হয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত যতীন্দ্রনাথের প্রিয় উক্তি ছিল, 'আমরা মরব, দেশ জাগবে।' বালাশোরের যুদ্ধে ইংরেজদের প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটলেও এই অভিযানে নেতৃত্বদানকারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট যতীন্দ্রনাথের সাহস, যুদ্ধকুশলতা ও দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'যতীন মুখার্জি যদি ইংরেজ হতেন, ইংরেজরা ট্রাফলগার স্কয়ারে নেলসনের মূর্তির পাশে তাঁর মূর্তি স্থাপন করত।'

১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা বালাশোর দিবস পালন করেছিলেন। বাংলায় এ দিবসটি পালনের প্রথম উদ্যোগ নেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। পঞ্জাবের বিপ্লবী ভগৎ সিং তখন বাঘা যতীনের এক সহযোদ্ধাকে লিখেছিলেন তাঁর আলোকচিত্র ও কিছু তথ্য পাঠাবার জন্য। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঘা যতীনের স্মরণে যে অগ্নিগর্ভ কবিতা লিখেছিলেন সেটি গ্রন্থাকারে *প্রলয়শিখায়* প্রকাশের পরই সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হতে পঞ্জাব থেকে চট্টগ্রাম, হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী মানুষ সব সময় বাঘা যতীনসহ অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মহান আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

তিন.

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, সূর্য সেন আর প্রীতিলতারা স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেদের জীবন দিয়ে ভারতবর্ষে যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন তার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখেছি বাংলাদেশে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শতকরা নব্বই ভাগ ছিলেন বয়সে তরুণ– তাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গের প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর স্বাধীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, সূর্য সেনরা স্বাধীনতার যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, আমরা তা সম্পন্ন করেছি।' ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিয়মতান্ত্রিক অহিংস আন্দোলন যেমন হয়েছে, তেমনি সহিংস সংঘাত ও খ- খ- যুদ্ধও হয়েছে। বাঘা যতীনের যুদ্ধ ও আত্মদান অনুপ্রাণিত করেছে লাহোরের

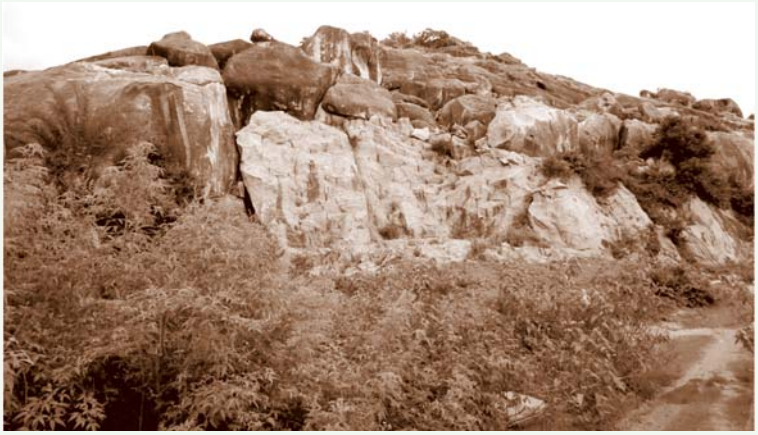

বালাশোরের কপ্তিপোদা গ্রামের যে স্থানে বাঘা যতীনরা তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন

ভগৎ সিং থেকে আরম্ভ করে চট্টগ্রামের সূর্য সেনদের। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সম্মিলিত আত্মত্যাগ অনুপ্রাণিত করেছে '৭১এর মুক্তিযোদ্ধাদের। '৭১এ বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধে যে অপরিসীম সাহস, দক্ষতা ও আত্মদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ভারতবর্ষে তার সূচনা করেছেন ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন ও সূর্য সেনরা।

১৯৯৪ সালে আমরা সূর্য সেনের জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রতিপক্ষ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি বলেছিল সূর্য সেনরা সন্ত্রাসী, সূর্য সেনের নামে বাংলাদেশে কোনও স্থাপনা থাকতে পারবে না। আমরা যখন বিপ্লবী বাঘা যতীনের মৃত্যুশতবার্ষিকী আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন গণমাধ্যমের একটি খবর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই আগস্টে (২০১৪) ভারতের স্বাধীনতার মাসে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলপাঠ্য পুস্তকে বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরামদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত এই সংবাদ আমাদের উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ করেছে।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের উত্তরাধিকার আমরা সবাই। ২০০৯ সালে শহীদ ভগৎ সিংএর জন্মশতবার্ষিকীতে পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীরা দাবি করেছিলেন লাহোরে এই বিপ্লবীর ফাঁসির স্থলে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের। মৌলবাদীদের কারণে এখনও তা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তি ভগৎ সিংকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে শ্রদ্ধা করলেও সেখানকার মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি তাঁকে সন্ত্রাসবাদী মনে করে। আমাদের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা চিরদিন প্রেরণার অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবেন।

ছবি অরিন্দম মুখার্জি

শাহরিয়ার কবির
লেখক, প্রাবন্ধিক

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ নভেম্বর

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

- ০২ নভেম্বর ১৯৩৫ ❖ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
- ০৩ নভেম্বর ১৯৩৩ ❖ অমর্ত্য সেনের জন্ম
- ০৪ নভেম্বর ১৯২৫ ❖ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্ম
- ০৫ নভেম্বর ১৮৭০ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম
- ১০ নভেম্বর ১৮৪৮ ❖ 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
- ১০ নভেম্বর ১৮৯৩ ❖ রবীন্দ্রসহচর অমল হোমের জন্ম
- ১০ নভেম্বর ১৯৫৪ ❖ কবি জয় গোস্বামীর জন্ম
- ১১ নভেম্বর ১৮৮৮ ❖ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম
- ১১ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ গজেন্দ্রকুমার মিত্রর জন্ম
- ১২ নভেম্বর ১৮৯৬ ❖ পক্ষীবিদ সেলিম আলীর জন্ম
- ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ ❖ হুমায়ূন আহমেদের জন্ম
- ১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ ❖ জওহরলাল নেহরুর জন্ম ॥ শিশু দিবস ॥
- ১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম
- ১৯ নভেম্বর ১৯১৭ ❖ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম
- ২০ নভেম্বর ১৭৫০ ❖ টিপু সুলতানের জন্ম
- ২৩ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম
- ২৫ নভেম্বর ১৯৩৪ ❖ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
- ২৬ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
- ২৭ নভেম্বর ১৮৭৮ ❖ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম
- ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ ❖ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম
- ৩০ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ বুদ্ধদেব বসুর জন্ম

সম্পর্ক

ঢাকায় ভারত ও বাংলাদেশের হাই কমিশনারদের সম্মেলন

১৪ নভেম্বর ২০১৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অনুষ্ঠিত *ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ হাই কমিশনারস্' সামিট*এ বাংলা দেশ এবং ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনাররা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন, পরে রাজনৈতিক কারণে এ সম্পর্কের উত্থানপতন ঘটায় কিছু দ্বিপক্ষীয় বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এসবের দ্রুত সমাধান হলে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ* এবং *ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন* আয়োজিত এ সম্মেলনে দুই দেশের প্রাক্তন হাই কমিশনারদের বক্তব্যের পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর পর্বে আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশ নেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। স্বাগত ভাষণ এবং সম্মেলনের সেশন পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আশেকা ইরশাদ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী ২০১০ সালে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর এবং চলতি বছর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সফরকে দুই দেশের জন্য ইতিবাচক বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে। দুই দেশের মধ্যকার সমুদ্রবিরোধ নিষ্পত্তির ফলে অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের পথ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতের বর্তমান সরকার বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী ভারতের সাবেক হাই কমিশনার আই এস চাড্ডা তিস্তা পানিচুক্তি সম্পাদনসহ দ্বিপক্ষীয় অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দুই দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও ঐকমত্যের ওপর জোর দেন।

ভারতের আরেক সাবেক হাই কমিশনার মুচকুন্দ দুবে নিরাপত্তা ছাড়াও দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দুই দেশের বাজারেই অবাধ প্রবেশের সুযোগ থাকা উচিত মন্তব্য করে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়ে সার্ক যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর পরস্পরের বৈরী সম্পর্কই দায়ী।

১৯৯৫ '৯৯ সাল পর্যন্ত ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সি এম শফি সামী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরে আস্থার সম্পর্ক থাকলেও পরে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ড. মনমোহন সিংয়ের সফরের পর সম্পর্ক উন্নতি হয়েছে। তবে দুই দেশের মধ্যেকার চুক্তিগুলোর বাস্তবায়নে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন নদীগুলোর পানির সুষম বণ্টন হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের আরেক সাবেক হাই কমিশনার ফারুক আহমেদ চৌধুরী সম্পর্কোন্নয়নে দুই দেশের সুশীল সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন, তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সার্ক ও আশিয়ানের মত আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ ভূমিকা রাখতে পারে।

২০০১ '০৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী ভারতের সাবেক হাই কমিশনার শ্রীমতী বীণা সিক্রি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বাংলাদেশে এক ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে, তবে ভারতে সরকারে পরিবর্তন হলেও পররাষ্ট্রনীতিতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এর সঙ্গে ভারতের জাতীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট, যা এত সহজে পরিবর্তনীয় নয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত থাকা প্রয়োজন, যার সঙ্গে বাংলাদেশের কানেকটিভিটিসহ অন্যান্য বিষয় জড়িত।

বাংলাদেশের চ্যানেল ভারতে না দেখানোর বিষয়ে করা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের চ্যানেল ভারতে দেখানোর ব্যাপারে সরকারিভাবে কোন বাধা নেই। ভারতীয় জনগণ বাংলাদেশের চ্যানেল দেখতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউটর পর্যায়ে সমস্যা রয়েছে বলে মন্তব্য করে তিনি সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের তথ্য বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এ সময় ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক হাই কমিশনার হেমায়েত উদ্দিন বলেন, ভারতীয় চ্যানেলগুলো বাংলাদেশে যত সহজভাবে চলতে পারে, ভারতে বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো তত সহজে পারে না। বাংলাদেশে ভারতের চ্যানেলগুলো উন্মুক্ত হয়ে যায়। ভারতে চ্যানেলগুলোর কর বেশি, যে কারণে বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো টিকতে পারে না।

১৯৯৫ সাল থেকে পাঁচ বছরকাল বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার দেব মুখার্জি উভয় দেশের অমীমাংসিত বিষয়গুলো ইতিবাচকভাবে দেখার আহ্বান জানান।

সাবেক হাই কমিশনার হারুন অর রশিদ বিসিআইএম বাস্তবায়নে কূটনৈতিকদের অবদানের প্রশংসা করে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, বিসিআইএমইসি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। অধিভুক্ত দেশগুলোর কৌশল, পরিকল্পনা ও তাদের সহযোগিতামূলক আচরণ এ প্রকল্পকে সফল করবে। পাশাপাশি অবকাঠামোগত সংযোগ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুবিধা, শিল্পোন্নয়ন, সাংস্কৃতিক এবং মানুষের মতবিনিময়ের মাধ্যমে এই প্রকল্পের উন্নতি সাধিত হবে।

ভারতের সাবেক হাই কমিশনার পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী সাইবার আক্রমণের বিষয়ে সকলকে সচেতন করে বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সামুদ্রিক সীমানায় দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে ৩০ লাখ জলবায়ু উদ্বাস্তু তৈরি হবে বলে খবর বেরিয়েছে। ভারতেও এর থেকে কোন অংশে কম হবে না। জলবায়ুসংক্রান্ত বিপদে দুই দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের বর্তমান হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন দুই দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ের এই আলোচনায় উভয় দেশের সম্পর্কের উন্নতি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনে ভারত ও বাংলাদেশের সাবেক হাই কমিশনারদের মধ্যে আলোচনায় আরো অংশ নেন, ফারুক সোবহান, হুমায়ুন কবির, তারিক করিম, রাজীত মিত্তার, তৌহিদ হোসেন প্রমুখ।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

রাষ্ট্রপতি ভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির সঙ্গে

সৌহার্দ

স্মৃতিময় আট দিন

সাবরিনা রহমান অর্চি

সেদিন ছিল ১৮ আগস্ট ২০১৪, সোমবার। আমাদের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারপারসন আমাকে আমার পাসপোর্ট নিয়ে ওই দিন তাঁর সঙ্গে বিভাগীয় অফিসে দেখা করতে বললেন। তাঁর আদেশমত সাক্ষাৎ করে জানতে পারলাম ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংবাদ মাধ্যম থেকে ১০০ তরুণ প্রতিনিধির ভারত ভ্রমণে যাওয়ার একটি মহা পরিকল্পনা চলছে। আমাদের বিভাগ থেকে আমিই ভারত যাওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, এফবিসিসিআই এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মোট একশোজন প্রতিনিধিকে ভারত ভ্রমণের উদ্দেশে মনোনীত করা হয়। এর মধ্যে অবশ্য একজন অধ্যাপক এবং একজন ক্রিকেটারও আমাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন। এই একশোজনের মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবতী মনে হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশজনসহ যে একশোজন তরুণতর ণী ভারতযাত্রার উদ্দেশে মনোনীত হয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগই ছিলেন পরস্পরের অপরিচিত। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা কেউ কাউকে তেমন জানতাম না, চিনতাম না কিন্তু এই ভ্রমণ আমাদের সবাইকে এমন এক মৈত্রিবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলল, যা হয়তো আমাদের কেউই কোনদিন ভুলতে পারবেন না। এর মধ্যে আমার ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল। সেই সুবাদে আমি তাদের আরও কাছাকাছি যেতে পারলাম। এ জন্য নিজেকে আরও বেশি ধন্য মনে করছি। যাই হোক, এবার শুরু হল আমাদের ভারত যাত্রার প্রস্তুতি। ভারত প্রজাতন্ত্র কেবল সমকালীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নয়, তার গুরুত্ব আমাদের কাছে আরও অনেক বেশি। ভারতেরই সক্রিয় সহযোগিতা, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সফল কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ করেছিলাম। কাজেই ভারতের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

রাজভবনে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের সঙ্গে

আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল মহারাষ্ট্রের মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের। ওখানে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম। দুপুরের খাবারের জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বুফে লাউঞ্জে। লাঞ্চ শেষে আমাদের ওইদিন মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জ এবং মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বন্ধুদের আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা আমাদের সারাজীবন মনে থাকবে। বিদেশের মাটিতে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার যে আবেগঘন মুহূর্ত সেদিন মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের উপহার দিয়েছিল, তার আনন্দ সত্যিই ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

সেই ভারতভূমিতে বাংলাদেশের যুব প্রতিনিধি হিসেবে পদার্পণ অবশ্যই আমাদের সবার কাছে ছিল গর্বের বিষয়। তাই প্রস্তাব প্রাপ্তির পরপরই আমরা কখন ভারতের পুণ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছব, এ নিয়ে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। আমরা সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে ভারতে পৌঁছনোর প্রহর গুণছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম– কবে, কখন ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশন আমাদের ভিসা দেবে। কথায় বলে অপেক্ষার সময় খুব দীর্ঘায়িত হয়। আমাদের মধ্যেও এমন অনুভূতি হতে লাগল।

যাই হোক, অপেক্ষার ধারাবাহিকতায় ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২জন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬জন এবং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ এর ৬জন বন্ধুকে নিয়ে গুলশানে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনে যাবার ডাক পেয়ে আমাদের সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। ওই দিন ভারতীয় হাই কমিশনে আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিলাম। যথাসময়ে ভিসা পাওয়া গেল। ভিসা পেয়েই আমাদের মনে হল যেন শাশ্বত ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছি। ভিসা প্রাপ্তির আশঙ্কা নিয়ে আমরা সবাই এতদিন চিন্তিত ছিলাম। ভিসা পেয়ে সেই আশংকা পুরোপুরি কেটে গেল।

১২ অক্টোবর ঢাকাস্থ ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আমাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম বা প্রস্তুতি পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই ওরিয়েন্টেশন সভায় ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ সরন, ডেপুটি হাই কমিশনার সন্দীপ চক্রবর্তী, হাই কমিশনের অন্যতম কর্মকর্তা সুজিত ঘোষ, মিডিয়া ও কালচার সহযোগী কল্যাণ কান্তি দাশ, সমকালীন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় গায়ক হাবীব এবং মডেল্ল অভিনেত্রী মেহজাবীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পঙ্কজ সরন আমাদের প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ দিক্ব নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সুজিত ঘোষ ও কল্যাণ কান্তি দাশের বক্তব্যও আমাদের সবাইকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে।

একদিন পর ১৩ অক্টোবর সকাল ৯.০০টায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে আমরা ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দু'ঘণ্টার ব্যবধানে আমরা দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আধুনিক স্থাপত্য নকশা দেখে আমরা সবাই বিমোহিত, আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে গেলাম। ওখানেই দুপুরের খাবার শেষে আমরা মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করলাম। দুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিট আকাশভ্রমণের পর আমরা মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। দীর্ঘ আকাশভ্রমণে আমরা সবাই ক্লান্ত। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে কয়েকটি বাসে করে আমাদের মুম্বইয়ের বিখ্যাত ভিট্স হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে গাঁদাফুলের মালা ও তিলক পরিয়ে আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল– আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম। ওই হোটেলেই আমাদের প্রথম রাত্রিযাপন। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ওই রাত আমাদের গভীর ঘুমে কেটে গেল।

পরদিন ১৪ অক্টোবর সকালের নাস্তার পরপরই আমরা মুম্বইয়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের প্রথম দর্শনীয় স্থান ছিল গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, যা আমরা সবসময় ভারতের বিভিন্ন সিনেমা এবং টিভি চ্যানেলে দেখে এসেছি। ওইদিন আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল মহারাষ্ট্রের মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের। ওখানে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম। দুপুরের খাবারের জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বুফে লাউঞ্জে। লাঞ্চ শেষে আমাদের ওইদিন মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জ এবং মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বন্ধুদের আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা আমাদের সারাজীবন মনে থাকবে। বিদেশের মাটিতে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার যে আবেগঘন মুহূর্ত সেদিন মুম্বই

অশোক হোটেলে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের উপহার দিয়েছিল, তার আনন্দ সত্যিই ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

পরদিন ১৫ অক্টোবর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বান্দ্রায়। আমরা কিংবদন্তী অভিনেতা শাহরুখ খানের বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি ওঠালাম। দুপুরের খাবারের শেষে স্থানীয় সিনেপেক্সে আমরা লেটেস্ট হিন্দি ছবি *ব্যাং ব্যাং* দেখলাম। অবশেষে জুহু সৈকতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের মুম্বই ভ্রমণের পর্দা নামল। একই হোটেলে রাত্রিযাপনের পরদিন দিল্লি ফেরার পালা।

১৬ অক্টোবর সকালের ফ্লাইটে আমরা দিল্লির উদ্দেশ্যে মুম্বই ত্যাগ করলাম। ইন্দিরা গান্ধী বিমান বন্দরে অবতরণের পর আমাদের দিল্লির নেহরু যুবকেন্দ্র, দিল্লি জাতীয় জাদুঘর, লাল কেল্লা, কুতুবমিনার, রাজঘাট প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। ১৭ অক্টোবর রাতে ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দিল্লির ঐতিহাসিক অশোক হোটেলে এক মনোরম ও চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় বন্ধুরা কথক নৃত্য, গান এবং ভরতনাট্যম পরিবেশন করে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। আমাদের গুণী বঙ্গসন্তানরাও তাদের আবৃত্তি, গান, নাচ, ফ্যাশন শো ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতীয় বন্ধুদের আনন্দ দেয়। আর তারই ফলশ্রুতিতে ভারতীয় আমন্ত্রিত অতিথিরা আমাদের উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান।

১৮ অক্টোবর এক অবিস্মরণীয় ঘটনা আমাদের জীবনে সাড়ী হয়ে রইল। ওই দিন সকালেই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারত প্রজাতন্ত্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীপ্রণব মুখার্জির সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ। এতবড় গুণী, প্রাজ্ঞ একজন বাঙালি মনীষীর দিক্ নির্দেশনামূলক ভাষণ সামনের চেয়ারে বসে শোনা সত্যিই এক বিরল অভিজ্ঞতা, এক অবিস্মরণীয় ব্যাপার। তাঁর ভাষণে উঠে আসে বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা, বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে ভারতবর্ষের অপরিসীম সাহায্য ও অবদানের কথা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অবকাঠামো বিনির্মাণে ভারতবর্ষের উদার সাহায্যের কথা। ওই দিনটি সত্যিই আমাদের জীবনে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

ওই দিন সন্ধ্যায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল নয়ডার এনআইইএসবিইউড্রি তে। পরদিন ১৯ অক্টোবর আগ্রার উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হল। আগ্রা ফোর্ট ও তাজমহলের শ্বেতশুভ্র সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখে আমরা সবাই বিমোহিত হয়ে গেলাম। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য তাজমহল সত্যিই আমাদের মানসলোকে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই স্মৃতি বুকে ধারণ করেই এবার আমাদের ঘরে ফেরার পর্ব শুরু হল। ২০ অক্টোবর সকালের ফ্লাইটে কলকাতার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলাম। পশ্চিমবঙ্গের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও আবেগাপ্লুত করে। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল কসবার অর্কজ হোটেলে। সেখানে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি ও বিশ্রামের পর বাসে করে আমাদের নেওয়া হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে আমরা গেলাম কলকাতার নিউ মার্কেটে। সেখানে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কেনাকাটা করলাম। এরপর সন্ধ্যার ফ্লাইটে স্বদেশ ভূমিতে ফিরে এলাম। এই আট দিনের ভ্রমণে আমরা ভারত প্রজাতন্ত্রের যে আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি, শাশ্বত ভারতবর্ষের যে সুমহান ঐতিহ্যে আমরা ঋদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়েছি, এই ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা যে একশোজন তরুণ্ণ তরুণী মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি, তার জন্য ভারত সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের কর্তাব্যক্তিদের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

১৭ অক্টোবর রাতে ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দিল্লির ঐতিহাসিক অশোক হোটেলে এক মনোরম ও চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় বন্ধুরা কথক নৃত্য, গান এবং ভরতনাট্যম পরিবেশন করে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। আমাদের গুণী বঙ্গসন্তানরাও তাদের আবৃত্তি, গান, নাচ, ফ্যাশন শো ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতীয় বন্ধুদের আনন্দ দেয়। আর তারই ফলশ্রুতিতে ভারতীয় আমন্ত্রিত অতিথিরা আমাদের উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান।

সাবরিনা রহমান অর্চি
শিক্ষার্থী

ছোটগল্প

নিজের ঘর

সুব্রত ম-ল

এক্সকিউজ মি স্যার! অর্পিতা আচ্ছন্ন গলায় বলে।

হ্যাঁ প্রথম বছরে আমরা আপনাকে কুড়ি লাখ টাকার প্যাকেজ অফার করছি। তার সঙ্গে আছে ইন্টারেস্ট ফ্রি কার লোন। সাবসিডাইজড হোম লোন। পাঁচ লাখ টাকার মেডিক্যাল বেনিফিট। আপনার প্রথম পোস্টিং হবে গুরগাঁওয়ে। এরপর পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় আপনার পোস্টিং হতে পারে। আমাদের কোম্পানির জগৎজোড়া সুনাম। আমরা একদম ননী থেকে তোলা ননী ছেলে-মেয়েকে নিই। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

অর্পিতার শরীরটা হঠাৎ হালকা হয়ে যায়। মাত্র দু'বছর এমসিএ করেছে। এখন চব্বিশ চলছে। সেক্টর ফাইভে একটা কোম্পানিতে আছে। দশ লাখ টাকার প্যাকেজ। বাড়ি থেকে গাড়ি রোজ নিয়ে যায়। বাড়িতে বাবা, মা, দাদু আর ছোটভাই। হাওড়ার পুরনো ঘিঞ্জি পাড়ায় পৈত্রিক বাড়ি। সেক্টর ফাইভ হয়ে বাইপাস দিয়ে মন্দিরতলা পর্যন্ত একটা রূপকথার আচ্ছন্ন ভাব থাকে। পাড়াতে গাড়ি ঢুকলেই নর্দমার পচা গন্ধ পায়।

সে কল্পনার চরমতম শিখরেও কোনদিন চিন্তা করেনি বিশ লাখ টাকা মাইনের চাকরি করবে। বাবা এখনও সরকারি চাকরি করেন, তিরিশ হাজার টাকা মাইনে পান। সংসারে কোনও অভাব নেই। মা তার প্রিয় পদগুলো তৈরি করে। মুগডাল, পোস্ত, সুক্তো, বড়ি দিয়ে মৌরলা মাছের অম্বল। দাদুর তৈরি পুরনো বাড়ি। কিন্তু স্বাচ্ছন্দের অভাব নেই। সে বাথরুমে গিজার, বাথটাব লাগিয়েছে। বাবার ঘরে, নিজের ঘরে এসি লাগিয়েছে।

ঝাঁচকচ কে নীল কাচের আড়ালে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে অফিস করে। বারো ঘণ্টা। দুপুরে বার্গার, কফি। বেরুবার সময় চায়না টাউনে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ার আর প্রন পকোড়া। তার জীবন এখন পাল্টে গেছে। পোশাক পাল্টে গেছে। টপ আর জিনসের প্যান্ট। কেনাকাটা সিটি সেন্টারে করে। সিনেমা দেখে আইনক্সএ। তার কাজ এয়ার লাই ন্সের প্রোগ্রাম করা। আমেরিকার ব্যস্ততম এয়ার লাইন্সগুলো তাদের কোম্পানির ক্লায়েন্ট। সে কোম্পানির চোখে ভেরি ভেরি ইমপর্টেন্ট পারসন।

তাদের কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বী শুভম্ সফটওয়ার তার কাজের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। গুরগাঁয়ে ওদের কর্পোরেট অফিস। সুতরাং শুভম্ সফটওয়ার যে তাকে কিনে নেবে তাতে আর আশ্চর্য কী! আন্তর্জাতিক সফটওয়ার কোম্পানি হিসেবে শুভম্এর স্থান বিশ্বে চার নম্বর। ভারত থেকে রপ্তানির ব্যাপারে তিন নম্বর। অর্পিতা নিজের হাত কামড়ায়। সে বুঝতে পারে শুভম্এর তা কে দরকার। খুবই দরকার। আর একটু বার্গেন করলে বোধহয় তিরিশ লাখের প্যাকেজও পাওয়া যেত।

সে কল্পনার চরমতম শিখরেও কোনদিন চিন্তা করেনি বিশ লাখ টাকা মাইনের চাকরি করবে। বাবা এখনও সরকারি চাকরি করেন, তিরিশ হাজার টাকা মাইনে পান। সংসারে কোনও অভাব নেই। মা তার প্রিয় পদগুলো তৈরি করে। মুগডাল, পোস্ত, সুক্তো, বড়ি দিয়ে মৌরলা মাছের অম্বল। দাদুর তৈরি পুরনো বাড়ি। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। সে বাথরুমে গিজার, বাথটাব লাগিয়েছে। বাবার ঘরে, নিজের ঘরে এসি লাগিয়েছে। হাওড়া ছেড়ে গুরগাঁও যেতে মন চাইছে না। এখানে তার আকর্ষণের মূল কেন্দ্রে আছে পাড়ার বন্ধুরা, মায়ের হাতের রান্না আর বুড়ো দাদু। ইসকুলক লেজে সাধারণ মেধার মেয়ে সে কিন্তু বাইরের বইয়ের প্রতি সাংঘাতিক আকর্ষণ। ছেলেবেলা থেকেই দাদু তার প্রিয় নাতনিকে বই কিনে দিয়েছেন। পাঠ্য বা অপাঠ্য। দাদুর ঘরে বই ভর্তি। পুরনো *দেশ, অমৃত, উল্টোরথ*। সে তার বন্ধু বা গাইড হিসেবে দাদুকেই ওপরের দিকে স্থান দেয়। এখন অর্পিতার সমস্যা অতিরিক্ত অর্থ। সে কী করবে প্রয়োজনাতিরিক্ত এত অর্থ নিয়ে?

একদিন ব্যাপারটা নিয়ে সে মন্দিরার সঙ্গে অফিসে আলোচনা করে। মন্দিরা তারই বয়সী। কারিগরী কলেজ থেকে বি টেক করেছে। সল্টলেকে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। নিজের গাড়িও আছে।

মন্দিরা বলল, সে কী রে? আমাদের তো চলছে না আর তোর টাকা উপছে পড়ছে? বেশি থাকলে দিয়ে দে। তারপর ওকে একটা লম্বা বাজেট পেশ করে। বলে, এটা আমার বাজেট। কী কষ্টে যে চালাই তোকে কী বলব। ফ্ল্যাট ভাড়াই পঁচিশ। গাড়িতে লাগে পনেরো। সংসার খরচা কুড়ি। মাসে এলআইসি, অন্য ইনভেস্টমেন্ট প্রায় দশ। কত থাকে? প্রায় সত্তর। ইনকাম ট্যাক্স ডিডাকশন আছে। সিগারেট, লিকার, ডিসকো। বয়ফ্রেন্ডদের সাথে একটু মজা করা। পাইতো বছরে দশ লাখ, চলবে কী করে বল?

সে আশ্চর্য হয় না। কিছুদিন আগে মুম্বইয়ের কোনও ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ পড়েছিল। বিষয় ছিল হাউ টু স্পেন্ড ওয়ান মিলিয়ান ইন এ মান্থ। প্রবন্ধকার সুন্দর একটা হিসাব পেশ করেছিল। পড়ে মনে হয়েছিল, ওয়ান মিলিয়ন কেন টেন মিলিয়নও খরচ করা কিছু ব্যাপার নয়।

পাড়ার বান্ধবীরা ধরেছে খাওয়াতে। প্রিয় বান্ধবী মালা বলল, কী রে অর্পিতা বড় চাকরি পেয়ে আমাদের ভুলে যাবি নাতো? যাবার আগে আমাদের একটা পার্টি দে। এমন পার্টি যা আমরা চিরকাল মনে রাখব। মালার বাড়িতে মা একতলায় একা থাকেন। বাবা পরলোকগত। মালা দু'তলায় থাকে। বন্ধুরা মাঝে মাঝে রবিবার মাংসভাত রেঁধে খায়। সারাদুপুর হইহই গান, বাজনা, ভিডিও। মালা সরকারি চাকরি করে। ইস্কুলে অর্পিতার থেকে পড়াশোনায় অনেক ভাল ছিল। কিন্তু সেক্টর ফাইভ সরকারি চাকরিকে হারিয়ে দিল। তবু বন্ধুত্ব রয়েই গেছে।

মালা আবার বলে, এমন পার্টি দে যা আমরা চিরকাল মনে রাখব, বলে একটু অর্থবোধক হাসে। অর্পিতা অফিসে এক মাসের নোটিস দিয়েছে। আর ক'দিন পরেই গুরগাঁও চলে যাবে। তার শুধু মনে হয় দাদু বোধহয় খুশি নয়। একটু দোটানায় পড়ে যায় সে। কী কারণ হতে পারে? সে কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। দাদুকে জিজ্ঞাসা করে, দাদু তুমি খুশি নও আমি চলে যাচ্ছি বলে?

দাদু হেসে বলেন, দূর পাগলি আমি খুশি, খুব খুশি।

অর্পিতা বলে, তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না, তুমি কিছু লুকোচ্ছ।

আমি কিচ্ছু লুকাইনি।

তুমিই তো আমায় শিখিয়েছ, গতিময়তাই জীবন আর স্থবিরতা মৃত্যু।

ঠিক তাই। আমার চিন্তা হচ্ছে অন্য।

কী অন্য?

তুই বাচ্চা মেয়ে, বছরে অতগুলো টাকা পাবি। ঠিক চালাতে পারবি তো?

দাদু আমি জানি দিনে কী করে এক লাখ টাকা খরচ করা যায়।

দাদু নাতনির দিকে অচেনা দৃষ্টিতে তাকান। বলেন, তোর পরিবর্তন হচ্ছে। আসলে জানিস কি, তোর গুরগাঁওয়ের চাকরিটা হচ্ছে বাঘের পিঠে দৌড়। থামলেই তোকে খেয়ে ফেলবে। অর্থ দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। আবার কিছু সমস্যা আছে অর্থ দিয়েও সমাধান হয় না। অর্পিতা একটু দমে যায়, দাদু কী বলার চেষ্টা করছে বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু থৈ পায় না।

পিকনিকের ব্যাপারটা সে মন্দিরার সঙ্গে আলোচনা করে।

মন্দিরা আমাকে বুদ্ধি দে তো।

কী বুদ্ধি?

পাড়ার বন্ধুরা ধরেছে একটা পার্টি দিতে। এমন পার্টি যা বন্ধুরা চিরকাল মনে রাখবে।

এ আর এমন কী কথা! তোর বাজেট কত।

সেটা অসুবিধা নেই, যা খরচ হবে আমি দেব।

তবে আর কী। বিরাট মস্তি হবে। তোদের ক'জন হবে।

ধর পাঁচজন, সব ছোটবেলার বন্ধু।

ক্যাটারিং সার্ভিসকে বলে দে। যা চাইবি পাঠিয়ে দেবে।

সে কী রে? নিজেরা মাংসভাত করব না?

তুই একটা হাউড়ে পাগল। পিকনিকে নিজেরা রাঁধলে, ফুর্তি করবি কখন?

ফুর্তি? অর্পিতার চোখ বড় বড় হয়ে যায়।

হাঁ ফুর্তি। লিকার, বাচ্চা বাচ্চা হ্যান্ডসাম ছেলে।

অর্পিতার মুখে কোনও কথা আসে না। শুধু বিড় বিড় করে বলে, হ্যান্ডসাম ছেলে!

মন্দিরা বল, হ্যাঁ, ছেলে। লেডিস পার্টি হবে আর ছেলে থাকবে না– এ আবার হয় না কী? এই তো সেদিন নিশার জন্মদিনে আলিপুরে এক্সক্লুসিভ লেডিস পার্টি ছিল, এজেন্সি থেকে দু'জন কিউট ছেলে

মন্দিরা রেগে যায়। বলে, এই তোর একি করছিস? চাকর-বাকরদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে? ওরাই-বা কী মনে করবে? এরা দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। খরচ চালানোর জন্য এসকর্ট সার্ভিসে যোগ দিয়েছে। আমাদের সেবা করার জন্য এদের ভাড়া করা হয়েছে। দেবপ্রিয়া বলে, স্নেহার সবেতেই ন্যাকামি। বয়স যেন বাও কি তেও। ততক্ষণে আনন্দ ওদের পানীয় সার্ভ করে। পে-ট্রি খাবার সাজিয়ে আনে। মন্দিরা গাস ওপরে তুলে বলে, উলাস।

পাঠিয়েছিল। কী ড্যান্স করল, তোকে কী বলব। মনে হচ্ছিল কামড়ে দিই। যদি আর একটু খরচা করিস আরও অনেক কিছু হবে।

অর্পিতা বোবা হয়ে যায়। শুধু বলে, এ রকম হয় না কী? ছেলে হায়ার করা যায়?

তুই তো বলছিস তোর টাকা খরচ হয় না। একবার ট্রাই করে দেখ না। আমাকে তোদের পার্টিতে নে, আমি দু'জন কিউপিডকে আনব। দেখলে থ হয়ে যাবি।

রবিবার পার্টির দিন ঠিক হল। মন্দিরাকে নিয়ে সাতজন।

পার্টির আগের দিন সে মালাকে কিছুটা আভাস দিল। বলল, তোর যদি আপত্তি থাকে তো বল। আমি ছেলেদের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি।

অন্য বন্ধুরা হই হই করে ওঠে। বলে, না না এ রকম পার্টি আগে কোনও দিন দেখিনি। মালা একটু ঠাণ্ডা গলায় বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোরা এনজয় করলে, আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি বরং সেদিন মাকে মাসির বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

বাড়িতে অর্পিতা দাদুর কাছে গিয়ে বসে। দাদু ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, অপু কিছু বলবি? অর্পিতা নরম গলায় বলে, দাদু তোমাদের ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। এখানেতো আমি কম মাইনে পাই না। গুরগাঁওয়ে গিয়ে কী হবে। অতিরিক্ত টাকা ছাড়া।

দাদু বলেন, কিছু পেতে গেলে কিছু ত্যাগ করতে হয়। নতুন জায়গা, নতুন মানুষজন, নতুন অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা ছাড়া মানুষ জ্ঞানী হয় না। আমাদের ছত্রছায়ার বাইরে জীবনের নতুন দিক খুলে যাবে। জীবনের নতুন মানে। অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে নতুন দায়িত্ববোধ।

পার্টির দিন। সর্বাণী আর অনুরাধা এল না। সব শুনে ওরা না কি ভয় পেয়ে গেছে। রইল পাঁচজন। মালা, সুদেষ্ণা, স্নেহা, দেবপ্রিয়া আর অফিসের বন্ধু মন্দিরা। ওর পাড়ার বন্ধুদের মধ্যে সে আর মালা শুধু চাকরি করে। স্নেহার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সুদেষ্ণা আর দেবপ্রিয়া চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ক্যাটারিং থেকে একগাদা স্নাক্স নিয়ে গেছে। স্যালাড, চিকেন পকোড়া, ফিশ ফিংগার, পনির পকোড়া। অর্পিতা তিনটে বড় বোতল ভদকা নিয়ে এসেছে। সব কিছু দেখে স্নেহা বলে, হ্যাঁরে আমরা কি অর্পিতার আইবুড়ো ভাত খাচ্ছি? সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। সুদেষ্ণা বলল, আয়োজন তো মন্দ নয়, কিন্তু মূল আকর্ষণ কোথায়?

দেবপ্রিয়া বলে, মূল আকর্ষণ?

হ্যাঁ মূল আকর্ষণ, কিউপিড।

অর্পিতা ঘড়ি দেখে। বলে, মন্দিরা এখুনি এসে যাবে, ওর গাড়িতে আসবে।

স্নেহা একটু উসখুস করে। হ্যাঁরে আমরা ড্রিঙ্ক করব, নেশা হয়ে যাবে না তো। বাড়ি যেতে পারব তো?

মালা বলে, ঠিক যেতে পারবি। আমরা কি মাতাল? বুঝেশুনে খাবি। এ রকম পার্টিতো আমরা কোনওদিন করিনি, অর্পিতার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে!

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় মন্দিরা হাজির হয়। সঙ্গে দু'জন সুদর্শন ছেলে। বয়স বাইশ-তেইশ, পেটানো চেহারা। অর্পিতা গুটিয়ে যায়। কী রকম ভয় ভয় করে।

এ রকম হয় নাকি? অবশ্য সে মন্দিরার কাছে বড়লোকদের লেডিস পার্টির বর্ণনা শুনেছে। তার হঠাৎ দাদুর কথা মনে পড়ে। দাদু যদি জানতে পারে! সব আনন্দ কি রকম ফিকে হয়ে আসে।

মন্দিরা বলে, আয় আলাপ করে দিই।

এর নাম জয় আর ওর নাম আনন্দ। এরা ইউনিক এসকর্ট সার্ভিস থেকে এসেছে। আজকের জন্য এরা আমাদের সার্ভেন্ট। আর আমরা মিসট্রেস।

জয় খুব সুইট ছেলে। অত্যন্ত অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। আনন্দও খুব মজার ছেলে।

কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়েই জয় হাঁটুমুড়ে বসে পড়ে। মাথা নিচু করে অর্পিতার পায়ের পাতায় গাঢ় চুমু খায়।

অর্পিতা সভয়ে বলে, একি করছেন, একি করছেন!

ওর হাত ধরে তুলে দেয়।

ততক্ষণে আনন্দও স্নেহার গোড়ালিতে জিভ স্পর্শ করে। স্নেহা দু'পা লাফিয়ে পিছু হটে।

মন্দিরা রেগে যায়। বলে, এই তোর একি করছিস? চাকর-বাকরদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে? ওরাইবা কী ম নে করবে? এরা দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। খরচ চালানোর জন্য এসকর্ট সার্ভিসে যোগ দিয়েছে। আমাদের সেবা করার জন্য এদের ভাড়া করা হয়েছে।

দেবপ্রিয়া বলে, স্নেহার সবেতেই ন্যাকামি। বয়স যেন বাও কি তেও। ততক্ষণে আনন্দ ওদের পানীয় সার্ভ করে। পেট্রে খাবার সাজিয়ে আনে। মন্দিরা গাস ওপরে তুলে বলে, উলাস। দু'এক পাত্রের পরই পার্টি জমে ওঠে। মনের কিন্তু কিন্তু ভাবটাও লঘু হয়ে যায়।

মন্দিরা মিউজিক সিস্টেমে গান চালিয়ে দেয়। ইংরেজি গান। মন্দিরা বলে, জয় আর আনন্দ দু'জনেই ভাল ড্যান্সার। তোরা ফরমায়েস করলে, ওরা নাচবে। ওরা কুকুর সাজতে পারে, বাঁদর সাজতে পারে, জংলী সাজতে পারে।

মালা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা নাচ দেখব। মালার মুখ লাল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মনে হচ্ছে কোনও অপদেবতা ভর করেছে।

মন্দিরা জয় আর আনন্দকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। বোধহয় নাচের পোশাকের জন্য।

অর্পিতা আর ওর বন্ধুরা নীরবে পান করে। ওরা কল্পনার চরমেও কোনওদিন চিন্তা করেনি এরকম পার্টি হতে পারে। অর্পিতা ওদের জিজ্ঞাসা করে, কী রে ভাল লাগছে না? স্নেহা বলে, হ্যাঁ ভাল লাগছে, তবে ভয় ভয় করছে। অর্পিতা বলে, কেন কুকুর কামড়ে দেবে?

দেবপ্রিয়া বলে, আসলে কী জানিস, আমরা কোনওদিন এরকম পার্টি দেখিনি, শুনিওনি।

সুদেষ্ণা বলে, হ্যাঁরে বেঁচে ফিরে যেতে পারব তো?

ওরা হো হো করে হাসে।

মন্দিরা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সবাই পোশাক পরিবর্তন করেছে। মন্দিরার কালো টাইট জিনসের হাফ প্যান্ট। কালো গেঞ্জি। সারা দেহে যৌবন উপচে পড়ছে। জয় ও আনন্দর পরনে শুধু টাইট অন্তর্বাস। জয়ের মুখে কুকুরের মুখোশ আর আনন্দের মুখে বাঁদরের। দু'জনের গলাতেই লম্বা চেন। মন্দিরা দু'হাতে ধরে আছে।

মন্দিরা ডাকে, জিমি আ তু তু। জয় কুকুরের ভঙ্গীতে ওর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খায়। আনন্দকে বল, আ যা মেরি জান। আনন্দ হুপ হুপ করে লাফায়।

জয় সবার পায়ের কাছেই জিভ দিয়ে চাটে। এখন সবাই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। পানীয় আর গানের সঙ্গে সঙ্গে পার্টির উত্তাপ বাড়ছে। অর্পিতা জয়ের চুলগুলো চেপে ধরেছে। মাথাটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে।

গুরদীপের সঙ্গে সে দু'একবার গেছে। গুরদীপ ওকে একটা সিগারেট এগিয়ে দেয়, বলে, চরস আছে খা। সে দু'টান দেয়। মাথা হালকা হয়ে যায়। চারদিকে মন-বিকল আলো। ঘুরছে। তীব্র সঙ্গীতের মুর্ছনা। উদ্দাম নাচ। স্টেজে কয়েকজন পরি আর কিউপিড নাচছে। অর্ধনগ্ন কিন্তু পূর্ণ নগ্নতার চেয়েও তীব্রতর যৌনতা। তার সারাশরীর সাবানের ফেনায় ভিজে গেছে। তার সামনে নাচছে গুরদীপ। সারা গায়ে ছেঁড়া থলে। দু'টি প্রায় উন্মোচিত ডালিম, আমন্ত্রণের ভঙ্গিমায় উন্মুখ।

আনন্দ বাঁদরের মত লাফাচ্ছে। সবার কোলে একবার করে বসছে। মন্দিরা একসময় আনন্দর মুখোশ সরিয়ে লম্বা চুমু খায়। তারপর কোল থেকে নামিয়ে, পশ্চাদ্দেশে এক লাথি মারে। আনন্দ হুপ হুপ করে উল্লাসে নাচে।

দেবপ্রিয়া চিৎকার করে বলে, আমরা এবার কুকুর আর বাঁদরের নাচ দেখব। হ্যাঁ হ্যাঁ নাচ দেখব। সবাই সমর্থন করে। মন্দিরা চিৎকার করে, এই কুত্তার বাচ্চা, এই বাঁদরটা। ভাল করে নাচ দেখা। মিসট্রেস খুশি হলে বখশিশ পাবি। বাড়িতে রুটির বদলে পরোটা খাবি।

ওরা ট্রেনড ড্যান্সার। সুঠাম চেহারা। নাচ আরম্ভ করে। মন্দিরা উঠে গান পালটে দেয়। মাইকেল জ্যাকসন। মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশ পালটে যায়। লিকার, গান, ওদের জংলি নাচ, গর্বিত যৌবন। আনন্দ নাচতে নাচতে মন্দিরার কাছাকাছি চলে আসে। মন্দিরা একটা একশো টাকা ওর অন্তর্বাসে ঢুকিয়ে দেয়। হাতে আর একটা পাঁচশো টাকা নাচায়। আনন্দ নিতম্বে বিচিত্র ভঙ্গী করে অন্তর্বাস অল্প সরিয়ে দেয়। মন্দিরা নোটটা অন্তর্বাসে ঢুকিয়ে দেয়।

সুদেষ্ণা ব্যাগ থেকে দুটো একশো টাকা বার করে জয়কে দেখায়। জয় কোমর দোলাতে দোলাতে ওর অন্তর্বাসের দিকে ইশারা করে। সুদেষ্ণা একটু বোকা বোকা হাসে। তারপর হঠাৎ জয়ের পোশাক নাবিয়ে দেয়। দুটো একশো টাকা গুঁজে দেয়।

মন্দিরা চিৎকার করে, থ্রি চিয়ার্স ফর অর্পিতা। হিপ হিপ হুররে। অর্পিতার চৈতন্য হোক। তারপর বলে, আমরা এখনও সার্ভেন্টদের সব সার্ভিস নিইনি। আমি মিসট্রেসদের অনুরোধ করছি তারা সার্ভেন্টদের কাছে ডেকে নিন যে কোনও পার্থিব সেবার জন্য। হাওড়ার মিসট্রেসরা দীর্ঘজীবী হোক।

অর্পিতা জয়কে কাছে ডাকে। মোবাইল নাম্বারটা নেয়। বলে, পরে কথা বলব। মন্দিরা হাসে। বলে, কীরে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবি নাতো?

পার্টি ক'টায় শেষ হয়েছে অর্পিতা জানে না। যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত প্রায় আটটা, মালার বিছানায় শুয়ে। মালা বলল, তুই আজ আমার বাড়িতে থেকে যা। আমি মাসিমাকে ফোন করে দিয়েছি। আবার তো কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে।

অর্পিতা জিজ্ঞাসা করল, পার্টির কী হল?

মালা বলল, তোর নেশা হয়ে গিয়েছিল। জয় কোলে করে আমার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেছে। খুব ভদ্র ছেলে।

আর ওরা?

ওরা অনেকক্ষণ ঘর বন্ধ করে আনন্দর সঙ্গে ছিল। কী হয়েছে জানি না। পরে জিজ্ঞাসা করব। তবে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার চিরকাল মনে থাকবে।

তুই ফোন নাম্বার নিয়েছিস।

হাঁ আনন্দর। জয় কাউকে ফোন নম্বর দেয়নি। কী কারণে বলতে পারব না। তবে তোকে একটা অনুরোধ করব। গুরগাঁওয়ে সাবধানে থাকবি। অত টাকা মাইনে পাবি, একা থাকবি। কোনও বিপদে পড়িস না। খুব সাবধানে বন্ধু বেছে নিবি।

আজ একমাস অর্পিতা গুরগাঁওয়ে এসেছে। একটা দু'কামরার ফ্ল্যাট নিয়েছে। অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে যায় দিয়ে যায়। সকাল ন'টা থেকে রাত আটটা ডিউটি। সকালে রুম সার্ভিস প্রাতঃরাশ দিয়ে যায়। আলুর পরোটা, ইডলি, ধোসা। দুপুরে অফিসের ক্যান্টিন। রুটি, ডালমাখানি, চিকেন। রাত্তিরে আবার রুম সার্ভিস। রবিবার নিজে রাঁধার চেষ্টা করে। ভাত, আলুভাতে, কোনও একটা তরকারি। এখন শুধু মায়ের রান্নার কথা মনে পড়ে। ডালমাখানি খেতে খেতে সুক্তোর কথা মনে পড়ে। চিকেন ভর্তা খেতে খেতে পার্শে মাছের ঝালের কথা মনে পড়ে। সে অর্ধেক খেয়ে উঠে পড়ে।

সে এখন শীতল নিঃসঙ্গতায় ভুগছে। যদিও একটা ঘর অফিসের সহকর্মীকে ভাড়া দিয়েছে। গুরদীপ কাউর। চণ্ডীগড়ের মেয়ে। ভীষণ সপ্রতিভ। চৌকস। একই পদে কাজ করে। মাঝে মধ্যে দেখা হয়। কারণ ওদের ডিউটির সময় ভিন্ন। মেয়েটির মনটা ভাল। অর্পিতাকে ওয়াইন খাওয়ায়। ওর বয়ফ্রেন্ডের গল্প করে। মাঝে মাঝে গুরদীপ রাতেও বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে থাকে। তাদের গল্প বলে। ছেলে বন্ধুরা নাকি বাঙালি লেড়কি আর কলকাতার রসগুল্লা ভীষণ পছন্দ করে। সুরজিত বলে একটা ছেলে আঠার মত লেগে আছে তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য। গুরদীপকে না কি সে এজন্য ব্যাঙ্ক চেক দিতেও প্রস্তুত। দু'একবার গুরদীপ তাদের ফ্ল্যাটে পার্টি দিতেও বলেছে। অর্পিতা সযত্নে এড়িয়ে গেছে।

রাতে খুব একা লাগলে সে একটু ওয়াইন খায়। জীবনানন্দের কবিতা পড়ে, বিভূতিভূষণ পড়ে। আস্তে রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে শুয়ে থাকে। ঘর অন্ধকার কিন্তু জানলার বাইরে গুরগাঁওয়ের আলোর বন্যা-প্লাবিত শহর। সে উঠে জানলা বন্ধ করে দেয়। বালিশে চোখের জল পড়ে। মনে মনে বলে, মালা আমি কত সুখে আছি দেখে যা।

সহকর্মীদের কয়েকটা পার্টিতে সে গেছে। বড় বাংলো বা ফার্ম হাউসে হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কোন কোনও রেভ পার্টিতে মেসিন থেকে সারা দেহে সাবানের ফেনা ছোঁড়া হয়। আবার অতিথিরা গায়ে শুধু জুটের ব্যাগ বা বড় বড় পাতার জামা পরে আসে। কিছু বিদেশীনি দেশিনীও আসে। সুঠাম নৃত্যশিল্পীরা। পুরুষ ও মহিলা। বেশ কিছু মহিলা বা পুরুষ এসকর্ট। অফুরন্ত লিকার। খুব সাবধানে ড্রাগ। সাবানের বুদবুদের মত যৌনতা।

গুরদীপের সঙ্গে সে দু'একবার গেছে। গুরদীপ ওকে একটা সিগারেট এগিয়ে দেয়, বলে, চরস আছে খা। সে দু'টান দেয়। মাথা হালকা হয়ে যায়। চারদিকে মনবিকল আ লো। ঘুরছে। তীব্র সঙ্গীতের মুর্ছনা। উদ্দাম নাচ। স্টেজে কয়েকজন পরী আর কিউপিড নাচছে। অর্ধনগ্ন কিন্তু পূর্ণ নগ্নতার চেয়েও তীব্রতর যৌনতা। তার সারাশরীর সাবানের ফেনায় ভিজে গেছে। তার সামনে নাচছে গুরদীপ। সারা গায়ে ছেঁড়া থলে। দু'টি প্রায় উন্মোচিত ডালিম, আমন্ত্রণের ভঙ্গিমায় উন্মুখ। গুরদীপ ওকে হাত ধরে টেনে নেয়। বুকে জড়িয়ে ধরে। কানে কানে বলে, এখন টেগোর সং ভুলে যা। ডু অর ডাই।

সে কতক্ষণ নেচেছিল মনে নেই। ভোরে ঘুম ভাঙে। মাটিতে শুয়ে। তাকে জড়িয়ে আছে প্রায় ছ'ফুট সাইজের এক সাহেব। কিছুতেই তার হাত থেকে মুক্ত হতে পারে না। সাহেব চোখ পিটপিট করে। বলে, হোয়ার আর য়ু গোইং বেবি? নাইট ইজ সো ইয়ং। বলে চকাস চকাস করে মুখে চুমু খায়। বিকট দুর্গন্ধ। অর্পিতা কোনওরকমে উঠে পড়ে। বেরিয়েই ড্রাইভারকে বলে, মোকাম চল।

সে এতক্ষণ নিজের দিকে লক্ষ্য করেনি। ওপরের টপ ভিজে। ব্রেসিয়ার ছেঁড়া। প্যান্টি ছেঁড়া। নিম্নাঙ্গে ব্যথা, পেটটা হালকা হয়ে আছে। বোঝে, সে ধর্ষিতা হয়েছে। জনসমক্ষে। জনগণ দ্বারা। জানলার কাচ খুলে ওয়াক ওয়াক বমি করে।

রাত্তিরে অর্পিতা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। সে কী বাঘের পিঠ থেকে পড়ে গেছে? সে ভীতু? সে এখানে কী করবে? কোন মনের মত সঙ্গী নেই। মনের মত খাবার নেই। কোনও লাইব্রেরি নেই। অবসর মানে লিকার, পার্টি আর স্টাড এজেন্সি। সে কতটা মানিয়ে নেবে? কী করে মানিয়ে নেবে!

দাদু, আমি হেরে যাচ্ছি। আমি বাঘের পিঠ থেকে পড়ে গেছি। এর জন্য তুমিও কিছুটা দায়ী। তুমি আমাকে সারাটা জীবন মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছ। আমাকে রাশি রাশি বই কিনে দিয়েছ। কিন্তু তুমি একবারও বলোনি মূল্যবোধকে মাঝে মাঝে ডেটল দিয়ে ধুয়ে নিলেও চলে। আবার নতুন সকাল আসে। নতুনভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়। মায়ের হাতের রান্নারও বিকল্প আছে। পৃথিবীর বহু মানুষ মায়ের হাতের রান্না না খেয়েও বেঁচে আছে।

ফ্ল্যাটে এসে একঘণ্টা ধরে চান করে। সাবান মাখে। এক গল্পাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ে। প্রায় পাঁচ-ছ 'ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। আজ রবিবার। অফিস নেই। কিন্তু এ কী হল? তার জীবনের প্রথম মিলনে সে ধর্ষিতা হল। একের অধিক পরুষ। যাদের সে চেনে না। কামনা করে না। এর জন্য দায়ী কে! গুরদীপ? না গুরদীপ নয়। সে স্বেচ্ছায় পার্টিতে মদ খেয়েছে। চরস খেয়েছে। নেচেছে। সে কলকাতার রসগুলা বা বেঙ্গলি লেড়কি। প্রচণ্ড লোভনীয়।

অর্পিতা রুম সার্ভিসকে ফোন করে। বলে, আজ একটু অন্য খাবার পাঠান।

কী খাবার পাঠাব ম্যাডাম? মাটন চাপ, রেগন জুস। থাই সুপ।

না না সিম্পল ভাত, ডাল, বড়িভাজা, শুক্তো।

ওসব বেঙ্গালি খাবার এখানে মিলবে না ম্যাডাম।

ঠিক আছে কিছু পাঠাতে হবে না।

সে রান্না বসায়। ভাত আলুভাজা আর মুগের ডাল। সঙ্গে মাখন।

একমনে রান্না করে। গুরদীপ এসে হাজির হয়। বলে, কী রে কেমন লাগল। মাল খেয়ে তো একদম ডাউন হয়ে ছিলিস।

অর্পিতা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, আমার ভাল লাগেনি। আর কোনওদিন যাব না।

সে কী রে! তোকে পাবার জন্য সারা অফিস লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই আমাকে এসব কথা বলিস না। আমার ঘেন্না করছে।

ন্যাকামি করিস না। তোর থেকে অনেক সুন্দরী মেয়ে অফিসে আছে। নিজেকে কী ভাবিস। রসগুলা?

পিজ গুরদীপ তুই থাম। আমি এসবে অভ্যস্ত নই।

তুই এখানে সময় কাটাবি কী করে বয়ফ্রেন্ড, পার্টি ছাড়া? অন্তত স্টাড এজেন্সির ছেলেদের তোকে নিতে হবে। কী সুইট কিউপিড!

আমি বই পড়ে, গান শুনে কাটিয়ে দেব।

টোগোর সং। দু'দিন পর তুইও ওই বুড়োটার মত হয়ে যাবি। কেউ তাকাবে না।

তাকানোর দরকার নেই। চাকরি করতে এসেছি। শুধু কাজ নিয়ে থাকব।

গুরদীপ ওর মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে, বলে, টিপিক্যাল বেঙ্গলি ক্যারেকটার, পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ। সাহস নেই, কাওয়ার্ড।

রাত্তিরে অর্পিতা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। সে কী বাঘের পিঠ থেকে পড়ে গেছে? সে ভীতু? সে এখানে কী করবে? কোন মনের মত সঙ্গী নেই। মনের মত খাবার নেই। কোনও লাইব্রেরি নেই। অবসর মানে লিকার, পার্টি আর স্টাড এজেন্সি। সে কতটা মানিয়ে নেবে? কী করে মানিয়ে নেবে! এসব তো সে শেখেনি। দাদু তাকে শেখায়নি। পাড়ার বন্ধুরা কোনওদিন বলেনি। নতুন পরিবেশ তাকে অভিজ্ঞতা দিয়েছে। সে নিজেকে চিনতে পেরেছে। সে কতটা এগোবে। কতটা পিছোবে? না কি মেনে নেবে সব কিছু?

তার এ মুহূর্তে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কোনও পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে। তার যন্ত্রণা ভাগ করে নেবার জন্য। মোবাইলে নম্বরগুলো দেখে। কিছু না ভেবেই জয়ের নাম্বারে বোতাম টেপে।

হ্যালো কে?

অর্পিতা বলছি।

গুরগাঁও থেকে?

হ্যাঁ জয় আমাকে একটা কথা বলতো, তুমি কেন এই নোংরা পেশায় পড়ে আছ। তুমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র!

কোন পেশাই নোংরা নয়। আমি খেটে পয়সা উপায় করি।

তোমার মনে হয় না মেয়েদের মনোরঞ্জন না করে কোনও মেয়েকে ভালবাস।

হাঁ মনে হয়, কিন্তু উপায় নেই। বাড়িতে মাবাবা। ভাই পড়াশোনা করে। বোনের বিয়ে দিতে হবে।

তুমি কত টাকা রোজগার কর?

মাসে প্রায় চলিশপ পঞ্চাশ। বড় পার্টি হলে বখশিশই পাই প্রায় দশবা রো হাজার। কিন্তু আপনি এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

অর্পিতা চুপ করে থাকে। আমার সমস্যা হয়েছে জয়। আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না। আমার চাকরি ভাল লাগছে না।

চলে আসুন। যখন ভাল লাগছে না চলে আসুন। আপনার যা ভাল লাগছে তাই করুন।

অর্পিতা অবাক হয়ে যায়। সে জয়কে কেন ফোন করল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেনা। তার কি জয়কে মনে হয়েছে সেও তার মত পেশায় অসুখী। না কি সেও অবচেতন মনে পুরুষের সঙ্গ পছন্দ করে– তাদের উত্তাপ– তাদের সহানুভূতি।

দাদু, আমি হেরে যাচ্ছি। আমি বাঘের পিঠ থেকে পড়ে গেছি। এর জন্য তুমিও কিছুটা দায়ী। তুমি আমাকে সারাটা জীবন মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছ। আমাকে রাশি রাশি বই কিনে দিয়েছ। কিন্তু তুমি একবারও বলোনি মূল্যবোধকে মাঝে মাঝে ডেটল দিয়ে ধুয়ে নিলেও চলে। আবার নতুন সকাল আসে। নতুনভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়। মায়ের হাতের রান্নারও বিকল্প আছে। পৃথিবীর বহু মানুষ মায়ের হাতের রান্না না খেয়েও বেঁচে আছে। পৃথিবীতে মাইকেল জ্যাকসনের লক্ষ লক্ষ অনুরাগী আছে, যারা টেগোর সং জীবনেও শোনেনি। তারা কি অসুখী? না কখনওই নয়। নীল তিমি, ডোডো পাখি, এরাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে, নিশ্চয়ই কোনও কারণে, যা তুমি জানতে না। তাই আমায় শেখাওনি। দাদু আমি সামনের মাসে হাওড়া ফিরে যাচ্ছি। আমার এখন সবচেয়ে বেশি দরকার তোমাকে। হে প্রাজ্ঞ পিতামহ, আমি কিছু প্রশ্ন করব। তুমি উত্তর দেবে। তারপর আমার পথচলা নিয়ে ভাবব।

সুব্রত মণ্ডল ভারতের গদ্যকার, কবি

স্মৃতিসুধা

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে কিছু সময়

সালেহা চৌধুরী

অনেকদিন আগে হুমায়ূন আহমেদের *নন্দিত নরকে* একটি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সময় ১৯৭১। আমার ছোট ননদ ইতি তখন আমাদের সঙ্গে থাকত। একদিন সে ছুটতে ছুটতে এসে বলে– হুমায়ূন আহমেদ নামের একজন একখানা ছোট উপন্যাস লিখেছেন। নাম *নন্দিত নরকে*– যেখানে একটি চরিত্র আছে যার ডাক নাম রুনু আর ভাল নাম সালেহা খাতুন। লোকটাকে আপনি চেনেন? বলি– না। উপন্যাসটি পড়ে ফেলি। বলা বাহুল্য, এরপর পাঠকের কি হয় সেটা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। এর পরের উপন্যাস *শঙ্খনীল কারাগার*। সেখানেও রম্নু নামের একজন উত্তম পুরুষের বোন। এই দু'টি গ্রন্থ পাঠ করবার পরে আমার হৃদয়ের ভেতর যে সব পলিমাটি থাকে সেখানে হুমায়ূন আহমেদ নামের একজনের বীজ নিজের জায়গা করে নেয়। কারণ এই দু'টি নামই আমার। হয়তো এ নাম তাঁরও প্রিয়। ছোট বীজ একদিন মহীরূহ হয়। এমনি করে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে একজনের সঙ্গে আরেকজনের প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠা নতুন ঘটনা নয়। জানি পুরো ঘটনা কাকতালীয়। তাঁর কোন কারণে রুনু নামটি প্রিয়। আরো দু'একটি উপন্যাসেও এই নাম ব্যবহার করতে দেখেছি। নিজের নামটাকে আগে কখনো এত ভাল লাগেনি এখন যেমন লাগে।

এরপর দু'একবার আলাপ হয়েছে। পরের দিকে আলাপটা বেশ একটু বিস্মৃত, একটু গভীরতার দিকেও গেছে। একসময় মনে আছে– তাঁর কি ভাল লাগে আর আমার কি ভাল লাগে, মেলাতাম। একদিন জানলাম তাঁর প্রিয় আমেরিকান ঔপন্যাসিক জন স্টাইনবেক। ঘটনাক্রমে এই প্রখ্যাত লেখক আমারও প্রিয়। আমি *অফ মাইস ম্যান* অনুবাদ করে তাঁকে উৎসর্গ করি।

আমি লন্ডন চলে গেলে তিনি আমার জিগাতলার বাড়িতে ফোন করে বলেন– সালেহা চৌধুরীকে বলবে ওঁর বই আমার ভাল লেগেছে। যে কোনদিন উনি নুহাশ পল্লি তে বেড়াতে আসতে পারেন। ইতোমধ্যে হুমায়ুন আহমেদের মা আয়েশা ফয়েজের গ্রন্থ পাঠ করি। খুবই ভাল লাগে। একদিন খালাম্মাকে দেখতে যাই তাঁর মীরপুরের বাড়িতে। সে যাওয়া অবশ্য তাঁর বই পড়বার আগে থেকে শুরু হয়েছিল। এরপর আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত। তাঁকে নিয়ে একটি বড় প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রইল। কেবল বলতে পারি– খলিল জীব্রান বলেছেন তাঁর বিখ্যাত কোটেশনের বইতে– 'ও কে আমি জানি। কারণ আমি তো ওর মাকে দেখেছি।' আমিও একই কথা বলতে পারি আয়েশা ফয়েজের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে। রত্ন প্রসবিনী নিজেও একজন রত্ন।

হুমায়ূন আহমেদের ষাটের জন্মদিনে লন্ডন থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম ফোনে। এবারে যখন দেশে আসি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম ওঁর জন্মদিনে নিজে গিয়ে একটা কার্ড দেব। অনেকের কার্ডের সঙ্গে তাঁর কার্ডটাও আমি লন্ডনে কিনেছিলাম। কার্ড দিতে গিয়ে নুহাশ পল্লি তে তাঁর জন্মদিনের উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আমি লেক্সিগ্রাম করতে ভালবাসি। কারো নাম নিয়ে, ভেতরের ইংরেজি অক্ষরগুলো এদিক ওদিক করে একটা ছোট ব্যাক্য বা কতগুলো শব্দ তৈরি করবার নাম লেক্সিগ্রাম। আমার কাছে এটা একটা মজার খেলা। যেমন আমার নাম সালেহার ইংরেজি অক্ষরগুলো নিয়ে লেক্সিগ্রাম করলে যা হয় সেগুলো এমন– Saleha– she leash, hale saleha. She sale. She heals. এমনি নানা কিছু। হুমায়ূন আহমেদের নামের ইংরেজি অক্ষরের লেক্সিগ্রাম অনেক কিছু হতে পারে। আমি কাটাকাটি করে একটি লেক্সিগ্রাম পছন্দ করি। Humayun Ahmed– Hymn you made. Hymn u have made, hymn u made। এইসব একদিন যখন মমতা গাছটা আমার হৃদয়ে বীজ বপন করে তখন থেকে এখন পর্যন্ত এমনি কোন বোধই আমি লালন করি। হিম বা প্রার্থনা সঙ্গীত, এমনি কোন ভাল নাম। কোন কোন অনুভূতির ওপর আমাদের নিজেদের কোন হাত নেই। এই অনুভূতির শেকড় হৃদয়ের অনেক গভীরে রয়ে যায়।

কেক, তেরোটি লাল গোলাপ এবং একটি কার্ড নিয়ে উপস্থিত হতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলাম। কার্ডে লেক্সিগ্রামের বাণী নিয়ে যখন যাই লজ্জা একটু পেয়েছিলাম বটে তবে তাঁর সাদর আমন্ত্রণে লজ্জাটজ্জা সব চলে গেল। আমন্ত্রণ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে বাড়ির সবকিছু ঠিকঠাক করে গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম নুহাশ পল্লির দিকে। এটা আমার দ্বিতীয় বার যাওয়া। গাড়িতে আমার সঙ্গী হলেন হুমায়ূন আহমেদের বন্ধু ইফতেখারুল ইসলাম এবং তাঁর ভাইপো সাদত। সারা পথ গল্পে গল্পে কেটে গেল।

নুহাশ পল্লি তে যখন পৌঁছলাম, রাত আটটা। আমাদের আগে আর কেউ তখনো যায়নি। পেছনে আসছেন এক বাস আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব। তিনি শাওন ও নিশাদকে নিয়ে অন্য একটা গাড়িতে। আরো কয়েকজন আসছেন তাঁদের নিজের গাড়িতে। পৌঁছেই বলেছিলাম– আমরা ফার্স্ট। চারপাশে তাকিয়ে আমি ও বারো বছরের সাদত এক সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলাম– ওয়াও। চারদিক আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে। মোমের আলোর অপরূপ স্নিগ্ধতায় নুহাশ পল্লি এমন এক রূপসী যার রূপের রহস্যে স্তব্ধ আমরা। সে যে কি মন ভোলানো দৃশ্য নিজের চোখে না দেখলে বর্ণনা করা যায় না! টেবিলে ধবধবে টেবিল ক্লথ। টেবিলের চারপাশে চেয়ার। এখান্নে ওখানে এমনি টেবিল পাতা, গাছের নিচে, গাছের ভেতর, গাছের ছায়ায়। পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল, প্রকৃতির দ্বীপ এই নুহাশ পল্লি। একটা চেয়ার টেনে বসতে না বসতেই আরো সব অতিথি এবং আত্মীয় স্বজন আসতে শুরু করলেন। ওঁর এক খালার কানে কানে বললাম– আমি কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের পরিবারের একজন। তিনি বললেন– পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল।

আমরা বসেছি। এরপর নেত্রকোনা থেকে আগত সঙ্গীতদল। তারা প্রথমেই বাজাল– আজ পাশা খেলব রে শ্যাম। পরিবেশটা আরো প্রিয় হয়ে ওঠে এমন সঙ্গীতে। এরপর তারা নানা সব সঙ্গীত শুরু করে। সবগুলোই বেশ উপভোগ্য। হুমায়ূন এইসব গায়কদের খুঁজে বের করতেন। সিলেটের কিছু গান তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তিনি হাছন রাজার গান খুব ভালবাসতেন। গান শুনছি, পাশে এসে বসেন খালাম্মার প্রতিবেশী বিগত আবদার রশিদের স্ত্রী রানু আপা। ব্যাস। তারপর দু'জনে মিলে নানা কথা আর হাসাহাসি।

একসময় হুমায়ূন আহমেদ সকলকে কাছাকাছি বসতে বলেন। মনে হয় এবার তিনি গান থামিয়ে সকলকে গল্প শোনাবেন। ঠিক তাই। তিনি বলেন নুহাশ পল্লি জায়গাটা যে ভূতের আখড়া সেই সব গল্প। এরপর তিনি ডাক দেন এমন কয়েকজনকে যাদের সঙ্গে ভূতেদের কোনরকমে যোগাযোগ হয়েছে। নানা সব গল্প। শাওন ব্যস্ত বার্বিকিউ নিয়ে। গায়ে এ্যাপ্রোন জড়িয়ে, খুন্তি হাতে সেও একটা গল্প করে। ভূতের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জার নামে একজনের– যিনি তখন ঢাকার বাইরে। তাই শাওন নিজেই হাত্ন পা নেড়ে, বড় বড় চোখ করে গল্পটা শোনায়। গল্পটা এমন– একবার শেষ বিকেলে চালেঞ্জার বসে আছেন নুহাশ পল্লির দীঘি পার হয়ে ছোট যে দ্বীপের মত জায়গাটা আছে, সেখানে। তিনি চা পান করছেন। ওই জায়গাটাই নাকি ভূতেদের জায়গা। তিনি সাহসী মানুষ। সকলকে বলে দিয়েছেন চলে যেতে। কারণ ওসব ভূত্ন টুত তিনি বিশ্বাস করেন না। বসে বসে চা পান করছেন আর চারিদিকের নিসর্গের শোভা উপভোগ করছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয় কে যেন তাঁকে লক্ষ্য করছে। প্রথমে কিছু না বলে উড়িয়ে দিলেও তাঁর মনে হয় সত্যিই কেউ তাঁকে দেখছে। একটু ভয় এসে তাঁকে বেশ চঞ্চল করে। তিনি কাপটাপ সব রেখে চলে আসতে চান নুহাশ পল্লির ভেতরের বাড়ির দিকে। এবার আওয়াজটা তার পেছনে। ঠিক পেছনে একটা চারপেয়ে না কে যেন তাকে তাড়া করছে। ভয়ে পেছনে তাকাতে পারছেন না। ছুটছেন। প্রথমে হাঁটা, তারপর দৌড়। সেই জন্তুটাও ছুটছে। তিনি শুনছেন পায়ের শব্দ আর নিশ্বাসের শব্দ। ওখানে একটা জায়গা আছে যেটা ভারত্ন বাংলাদেশের বর্ডারের মত, ভূতের রাজ্য আর মানুষের রাজ্যের কাঁটাতারের বেড়ার মত। সে জায়গাটা পার হলে ভূত থাকে না। তিনি অবচেতন মনে সে জায়গাটা পার হতেই শব্দ নেই।

রানু আপা মনের ভুলটুল কিছু বলতে গেলে বলি, 'ভূতের গল্প স্পয়েল করবেন না। দেয়ার আর মেনি থিংগস ইন হেভেন এ্যান্ড আর্থ হোরেশিও।' এরপর হুমায়ূন আহমেদ একটা প্রস্তাব দিলেন– আপনাদের পাঁচজনের ভেতর থেকে কোন একজন এখন গিয়ে সেই দীঘির নৌকাটাতে কি কিছুক্ষণের জন্য বসে থাকতে পারবেন? আমি প্রতিজ্ঞা করছি কাউকে সেখানে ভূত সেজে পাঠাব না। অন্যরা রাজি হলেও আমি বলি– না। আমার জিগাতলার বাড়িতেও ভূত আছে। কাঁধে করে আরেক ভূত নিয়ে যাই, তারপর ওদের ঝগড়া মেটাতে মেটাতে আমার জীবন শেষ হোক। শেষপর্যন্ত কেউ যায়নি। উনি বললেন ওদের জায়গা দখল করেছি তাই শেষ পর্যন্ত ওদের জন্য তিনটা শেওড়া গাছ, নিম গাছ আর একটা মান্দার গাছ লাগিয়ে ওদের এ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছি। – ভূতেদের এ্যাপার্টমেন্ট? সত্যি তিনি যে এত মজার কে আগে জানত! যারা তাঁর বই পড়েন আর কাছে থেকে দেখেন, তাঁদের অনেকেই নিশ্চয়ই জানেন। এরপর খাওয়া দাওয়া। খাসির রোস্ট থেকে আরম্ভ করে কি নেই! টেবিলে সাল্লি সারি সাজানো, সঙ্গে শাওনের বার্বিকিউয়ের মুরগি। যেহেতু প্রাণীদের জন্য দুঃখ অনুভব করে আমি তিরিশ বছর মাংস খাই না তাই স্লে সবের স্বাদ কেমন হয়েছিল বলতে পারব না। তবে যারা খেয়েছেন বলেছেন– চমৎকার! আমি সবজি, সালাদ আর ডাল খেয়েও খুব আনন্দ পেয়েছি। ওই সব গাছপালার ভেতরে থাকতে পারাটাই বড় কথা, খাওয়া নয়। কিন্তু সেসব শুনতে হুমায়ূন আহমেদের বয়েই গেছে। তিনি খাওয়াতে ভালবাসেন। যারা জানেন তারা আমার সঙ্গে একমত হবেন।

রাতে আকাশে ফানুশ ওড়ানো হল। সে এক মজার দৃশ্য। আগেও ওঁর বাড়িতে ফানুশ ওড়ানো দেখেছি। সেটা ছিল নিশাদের জন্মদিন। তিনটে ফানুশ উড়েছিল আকাশে। জ্যোৎস্না ভালবাসলেও সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। তার ফলে ফানুশ কালো আকাশে উড়তে উড়তে কোথায় যে চলে গেল কে বলবে! অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম আকাশে। অনেক দূরের আকাশে বেশ কতক্ষণ তারার মত টিপ টিপ করে জ্বলছিল

ফানুশেরা। চেয়ারে বসে সেই ফানুশের তলায় কতক্ষণ কথা হল। তারপর ঘাসের ভেতর দিয়ে হেঁটে আমরা সবাই বাড়িতে ফিরে আসি। আবারও কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর ঘুমের ব্যবস্থা। অবাক কা-ই বটে! প্রায় পঞ্চাশজন অতিথির ঘুমের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমি ও রানু আপা পেলাম একটি খাট, একটি ঘর ও একটি বাথরুম। প্রায় রাত তিনটা তখন। ঘুমের বড়ি খেয়ে দে ঘুম!

সকাল আটটায় উঠলাম। দু'চোখের ঘুম মুছে ফেলে ভাবলাম এবার হাঁটতে যাব। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে থাকলেও দু'একজন উঠেছে। আমি একা একা পথ পেরিয়ে, ওষধি গাছের অরণ্য ছাড়িয়ে এসে বসলাম পুকুর ঘাটে। এটাই নাকি ভূতেদের আস্তানা। এখন ভয় লাগছে না। রোদ ভরা, আলো ভরা পৃথিবী। নৌকা বাঁধা আছে ঘাটে। চারিদিকের দৃশ্য একজনকে এখানে বসিয়ে রাখতে পারে অনেকক্ষণ। দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। আসলে সৌন্দর্য আর মানবতা আমাকে অশ্রুসিক্ত করে। আর যিনি এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন তিনি অবশ্যই অসাধারণ।

ওষধি বাগানে পৌঁছে তাকিয়ে থাকি গাছগুলোর দিকে। কত রকম গাছ যে এখন মনে করতে পারছি না। নোট করে আনা উচিত ছিল। তুত, গাব, নিম, ওলটকম্বল, আর্নিকা, অশ্বগন্ধা, আমলকি, গোলমরিচ, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচি, লায়লামজনু, এমনি হরেক গাছ। প্রতিটি গাছে ছোট করে নাম ও বোটানিক্যাল পরিচয় লেখা আছে। আমি তাকিয়ে আছি বিস্ময়ে। ফিরে আসতে গিয়ে দেখি দু'টি মেয়ে শিউলি ফুল কুড়িয়ে কোঁচড় ভর্তি করছে। নাকের কাছে ধরতেই ফিরে এল আমার ছেলেবেলা। ফুল কুড়ানোর দিন। মেয়েরা একমুঠো ফুল দিল আমাকে। সেগুলো ব্যাগে ভরে রাখলাম। খালাম্মা, রানু আপাও হাঁটছেন। ওরা বললেন– কোথায় ছিলেন এতক্ষণ।

ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় চা পান করছেন হুমায়ুন। বসলাম পাশে। হাতে তাঁর *কাঠপেন্সিল* নামের বই। একটি বই আমাকে দিলেন। এবার লন্ডন থেকে আসবার সময় তাওবাদের উপর একটি বই এনেছিলাম ওঁর জন্য। বইটির নাম *টেলস ফ্রম তাও*। বইটি তাঁকে উপহার দিতে গিয়ে যে কোটেশন লিখে দিয়েছিলাম দেখলাম কাঠপেন্সিলের প্রথমে সেই কোটেশন। ভাল লাগল।

নাস্ত্মা খেতে হবে। সেই গাছপালার ভেতরে পাতা ধবধবে টেবিল। টেবিলে গরম খিঁচুড়ি, ডিমের তরকারি আর সালাদ। চমৎকার লাগল। খেতে খেতে দেখি সেইসব গায়ক এসে গেছে। একজন নতুন গায়কও এদের সঙ্গে। বলি– গাছের ভেতরে খিঁচুড়ি খেতে খেতে দেখি একদল কমলা ও হলুদ পোশাক পরা গায়ক হাতে বাজনা নিয়ে এসেছে গান শোনাতে– এমন কথা লিখলে পাঠক বলবেন এইসব রূপকথা কেন? কিন্তু এখানে রূপকথাই সত্যি। খাওয়া হল তারপর শুরু হল পালা। সেকেন্দার বাদশার পালা। বেশ মজার। সবাই মন দিয়ে শুনছে। মাঝে মাঝে প্রশ্নও করা হচ্ছে। যখন এসব শেষ হল বারোটা বাজে। হুমায়ূন আহমেদ বললেন– এই সেকেন্দার আসলে আলেকজান্ডার দি গ্রেট। তিনি মারা যাবার পর বলেছিলেন আমার মৃতদেহ মেসিডোনিয়ায় নিয়ে যাবার সময় আমার একটি হাত বের করে রাখবে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন– এই পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ জয় করলেও মৃত্যুর পর আমি খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি আরেক জগতে। সঙ্গে কেউ এবং কিছুই যায় না সেটাই সবাই জানুক। আমার মনে পড়ে গেল টলস্টয়ের গল্প– কতটুকু জমি দরকার। বললাম– মৃত্যুর পর ওইটুকুই প্রয়োজন কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে এর চেয়ে আরো বেশি কিছুর দরকার। হুমায়ূন বললেন– টলস্টয় গল্পের শিরোনাম ভুল করেছেন।

এরপর শুরু হল আল্লাহ ও ধর্ম সর্ম্পকিত নানা মজার কথা। তিনি বললেন কাকরাইল মসজিদে গিয়ে তিনি ওখানকার মৌলভী সাহেবদের কত সব ধর্মসম্পর্কিত কথা বলেছেন। তাঁর বলার ধরনে কেউ তাঁর উপর রাগ করেনি বরং হেসেছে। হতেই পারে। তাঁর অসাধারণ কথা বলার কারণে রাগ করতে পারে কেউ? এর মধ্যে একজন সাধারণ মামা মানে হুমায়ূন আহমেদের ছোটবেলায় কোল্লে পিঠে মানুষ করেছেন এমন এক মামা বললেন– এই যে আল্লাহর একশো একটা নাম সেখানে কোন মেয়ের নাম আছে কি? কাজেই আল্লাহ পুরুষ। বললাম– এবার নারীবাদীরা এসে আপনার ইন্টারভিউ করবেন। এবার আমরা হুমায়ূনকে প্রশ্ন করলাম– আল্লাহ বলতে আপনি কি বোঝেন? উনি বললেন– আলোর ভেতরে আলো। আমি বলি– রিজরভয়ের অফ এনার্জি। এবার শুরু হল অন্য প্রসঙ্গ। হুমায়ূন আহমেদ বললেন– টলস্টয় যখন এক রেলস্টেশনে মারা যান তাঁর পকেটে ছিল *সেইংস অফ প্রফেট* নামের একটি বই। বইটি পরে ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন বের করেছে। এই অমূল্য বইটির ভূমিকা লিখেছেন মহাত্মা গান্ধী।

তিনি একটা অসম্ভব মজার গল্প করেছিলেন। তখন তাঁর কেবল একটু একটু নাম হয়েছে। তিনি তিন মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে আজমির বেড়াতে গিয়েছেন। ওখানে পৌঁছে তিনি নাকি সকলকে বলেছিলেন– এখানে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। এরপর ফেরার সময় হল। তাঁর মেজমেয়ে আজমিরের দেয়াল ধরে বলছে– আমি কিছুতেই যাব না। কারণ তুমি বলেছ এখানে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। আমি এক বস্তা টাকা চেয়েছি, সেটা না পেলে যাব না। মেয়ে কিছুতেই যাবে না। সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে– আমি এক বস্তা টাকা নিয়ে তারপর যাব। যাই হোক অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শুনিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে আনা হল। তিনি বললেন– এরপর থেকে সত্যিই আমার লেখার জন্য বস্তা বস্তা টাকা পেতে লাগলাম। এই মেয়েই বোধহয় আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। আমরা তো গল্প শুনে অবাক।

এরপর আরো ছোটখাটো কথার পর আমরা গেলাম গোসল করতে বা হাত্ম মুখ ধুতে। তখন সুইমিং পুলের শীতল পানিতে নেমেছেন অনেক মা আর তাঁদের সন্তান। আমি নামিনি।

দুপুরে খাবার আয়োজন দেখে চোখ ছানাবড়া। গতরাতে নিরামিষ খেয়েছি। সেটা ভোলাতেই কি এত আয়োজন? আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, শিম ভর্তা, রুই মাছের কালিয়া, রুই মাছের মুড়িঘন্ট, লাউ চিংড়ি, ডাল, সালাদ। সঙ্গে রাশি রাশি ছোট পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ। বললাম– এই কারণে আপনি বেহেশতে যাবেন। এত মানুষকে এমন প্রাণভরে খাওয়ানো সহজ নয়। তিনি উত্তর দিলেন না। খাওয়ার পর ফিরে আসতে আসতে শাওন বলল– এখানে এমনই হয়। রাতে মাংস। দিনে মাছ।

সেবারের জন্মদিনে তাঁর মায়ের ইচ্ছায় য়ে সব আত্মীয়স্বজন বুড়ো হয়ে গেছেন, গ্রামে থাকেন– তাদের দাওয়াত করা হয়েছিল। সেবার ছিল তাঁর একষট্টিতম জন্মদিন। উনি বললেন– যারা আমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন সেইসব মানুষ। গ্রামের মামা, চাচা, খালা, কাজিন এইসব মানুষ।

খাওয়ার পর আসার পালা। আমি আর তাঁর বন্ধু ইফতেখারম্নল ও তার ভাইপো সাদত শালবনের ভেতর দিয়ে গল্প করতে করতে রওনা হলাম।

পরদিন রানু আপাকে ফোন করতেই উনি যা বললেন তাতে মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা আসার পর নাকি একজন ম্যাজিসিয়ান এসে প্রায় বিশটা ম্যাজিক দেখিয়েছেন। ম্যাজিকগুলো ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য। আমার নিজের জন্য খারাপ লাগল, সাদতের জন্য আরও বেশি খারাপ লাগল। সাদত নিজে একদিন ম্যাজিসিয়ান হতে চায় এবং হুমায়ূন আহমেদের ম্যাজিকের খেলায় ও নিজেকে তাঁর শিষ্য মনে করে।

তাঁর বাড়িতে আমার ছিল অবাধ গতি। কাজেই কখনো কাউকে বলতে হয়নি আমি কী যেতে পারি? গিয়ে দেখতাম লিখছেন। সোজা শোবার ঘরে গিয়ে মেঝেতে বসে কতসব গল্প তখন। শাওন একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠত। আমরা গল্প করতাম। তবে সন্ধ্যার আসরে যাইনি কখনো। সে আসর ছিল অনেকের। কত সব গল্প হত– যার কোন সত্যিকার অর্থই হয় না। যেমন একবার এক টুকরো পাথর তাঁকে দিয়ে বললাম– এর ভেতরে আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন? তিনি অনেকক্ষণ দেখলেন। তারপর বললেন– কিছু না। আমি বললাম– আমি কিন্তু সবসময় এই পাথরে একজন নারী এবং একজন পুরুষ দেখতে পাই। তিনি আবার অনেকক্ষণ সে পাথর ধরে রইলেন চোখের সামনে। বললেন– পাথরে আপনার দেখা নাঙ্গী পুরুষ আমাকে দেখা দেবেন না।

আমাকে একবার তিনি একটি বই উৎসর্গ করেছিলেন। সে স্মৃতি আমার মনে অম্লান হয়ে আছে। আমি তখন বইমেলাতে। আমার স্বামী

> একবার নুহাশ পল্লিতে আমি আর হুমায়ূন আহমেদ বসে আছি। আমি বললাম– জানেন আপনাকে নিয়ে আমি এক মজার স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি আমি আর আপনি আকাশের তারা দেখছি। আমি প্রশ্ন করলাম– এই তারার নাম কী? আপনি বললেন প্রক্সিমা সেন্টরি। শুনে তিনি বললেন– ও অনেক দূরের তারা। আমি আপনাকে এর চাইতে কাছের জ্বলজ্বলে তারা এনে দেব। আমার চোখ ভিজে উঠেছিল পানিতে।

তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী আমাকে ফোন করে বলেন– সুখবর। বললাম কী?– হুমায়ূন আহমেদ তোমাকে একটি বই উৎসর্গ করেছেন। তিনটি বই, এক গোছা ফুল আর কিছু মিষ্টিসহ আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললাম– বইটার নাম কী? তিনি বললেন– রূপা। আমি মেলাতে সে বই খুঁজে বের করে উৎসর্গের সুন্দর বাণী পাঠ করি। বলা বাহুল্য, এমন ঘটনা আমার জীবনে খুব বেশি নেই।

একবার লন্ডন থেকে টেক্সট ম্যাসেজ পাঠিয়ে তাঁকে বলেছিলাম– আমার খুব ইচ্ছা আমরা দু'জনে একটি বই করি। অতিপ্রাকৃত একটা বই করলে কেমন হয়? তিনি উত্তরে লিখেছিলেন– ও কে। মাসের পর মাস সেই 'ও কে' আমি আমার মোবাইলে সেভ করে রেখেছিলাম। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলেন– একসঙ্গে একটা ভূতের বই? হবে। আমি বললাম– আমি একটা অতিপ্রাকৃত বই করব ভাবছি। আপনি কী চমৎকার একটা ভূমিকা লিখে দেবেন? বললেন– অবশ্যই। এরপর অসুস্থ হয়ে তিনি আমেরিকা চলে গেলেন। বইটা সে বছর আমি প্রকাশ করিনি। ভেবেছিলাম ফিরে এসে ভূমিকা লিখে দেবেন। তারপর আমি ছাপাব। তিনি ফিরে এলেন না। তাঁর ভূমিকা ছাড়াই বইটা ছাপা হল। তাঁর মৃত্যু মেনে নেওয়া শক্ত। এত চমৎকার একজন মানুষ কেন এত তাড়াতাড়ি এই পৃথিবী থেকে চলে যাবেন? ঈশ্বর সেই কেনর উত্তর না দিয়ে তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। আমার মনে হয় ঈশ্বরের বাগান দেখাশোনার জন্যে এই মানুষটিকে তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল। এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে ক'জন পারেন?

হাসিখুশি এই মানুষটির ভেতরে জমে ছিল কষ্ট। কষ্টের প্রধান কারণ তাঁর তিন মেয়ে আর ছেলে নুহাশ। ওদের কথা বলতেন সহজ করে। যেমন সহজ করে লেখেন। কিন্তু সহজ কথার অন্তরালে যে গভীরতা তাকে বুঝতে পারা সকলের জন্য সহজ নয়। *অন্ধকারের গান*-এর ফরিদার মত এসব শুনে আমার বুকে ফিক ব্যথা উঠত। এখনো তাঁর কথা মনে করে ফিক ব্যথা ওঠে। কেন চলে গেলেন এমন একজন মানুষ?

একবার নুহাশ পল্লি তে আমি আর হুমায়ূন আহমেদ বসে আছি। আমি বললাম– জানেন আপনাকে নিয়ে আমি এক মজার স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি আমি আর আপনি আকাশের তারা দেখছি। আমি প্রশ্ন করলাম– এই তারার নাম কী? আপনি বললেন, প্রক্সিমা সেন্টরি। শুনে তিনি বললেন– ও অনেক দূরের তারা। আমি আপনাকে এর চাইতে কাছের জ্বলজ্বলে তারা এনে দেব। আমার চোখ ভিজে উঠেছিল পানিতে। তিনি এখন অনেক দূরের তারা। সেদিন হয়তো আমি বুঝতেও পারিনি তিনি একদিন দূরের তারা হয়ে যাবেন।

অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা পেয়েছি আমি। যার ঋণ আমি আজীবন মনে রাখব। যে কোন টেক্সট ম্যাসেজের উত্তর, বাড়ির দরজা আমার জন্য অবারিত, আমি যদি ইচ্ছা করি নুহাশ পল্লি তে আমার ল্যাপটপ নিয়ে গিয়ে লেখালেখি করতে পারি যখন মনে হয়, এমনি নানা কিছু। এমন করে কে আর আমাকে বলবেন?

শতায়ু হবার প্রার্থনা ছিল আমাদের। শতবর্ষের শোক রেখে চলে গেছেন। আমি জানি, ঈশ্বরের সেই বাগানে তাঁর মত একজন বৃক্ষপ্রেমীর বেশি প্রয়োজন। ঈশ্বর হয়তো বলছেন– বাগানটাকে তোমার মনের মত করে সাজা তো বাপু। বাগানের হাত তো তোমার অসাধারণ! আরেকজন হুমায়ূন আহমেদ আর কখনো আসবেন বলে মনে করি না। তিনি অনন্য তিনি একক।

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তার কয়েকটি কারণ আমি সনাক্ত করার চেষ্টা করেছি। কারণগুলো আমি ক্রমান্বয়ে সাজাবার চেষ্টা করেছি:

এক. তাঁর ভাষা সহজ। পাঠকের বুঝবার ক্ষমতার ওপর খুব বেশি দাবি নেই।

দুই. আমাদের চারপাশের মানুষের চালচিত্র। মনে হয় এইসব মানুষ আসলে আমরা কিংবা আমাদের প্রতিবেশী কিংবা এমন একজন যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে।

তিন. মধ্যবিত্ত জীবন। বড় বড় মানুষের কথা নেই। এইসব মানুষ যারা রাতে কোন কোনদিন দুইবার ভাত খাওয়াকে উৎসব মনে করে। একজন অতিথি আসবে বলে বিয়ের শাড়ি পরে অপেক্ষা করে একজন নারী। কারণ? এ ছাড়া তার আর কোন ভাল শাড়ি নেই। এরপরেও আমরা বলব, হুমায়ূন আহমেদ দুঃখ বোঝেন না?

চার. ছোট বই। খুব বেশি পাঠকের সময় কেড়ে নেয় না। যেমন নাদিন গর্ডিমার বলেন– আমাদের বর্তমান জীবনে সময় খুব কম। কাজেই আমি বলতে ভালবাসি আসলে এই যুগ ছোটগল্পের যুগ। ছোট বইয়ের যুগ।

পাঁচ. ছোট বই মানেই বড় কোন কথা বলে না, এটা ঠিক নয়। ওল্ড *ম্যান এ্যান্ড দি সি, স্নো গুজ, পাসটোরাল সিম্ফনি* নামের ছোট বইগুলোর কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। *গীতাঞ্জলিই* বা কতবড় বই ছিল! না, আমি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করছি না। তবে তিনি যে এসব লিখে নোবেল পেতে পারতেন সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় মৃত মানুষকে নোবেল দেওয়া বাতিল হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর *নন্দিত নরকে বা অচিনপুর* এর কথা মনে করা যেতে পারে। কিংবা আরো অনেক বই। *আয়না ঘর* এর সেই রহস্যের কথা আমরা কী করে ভুলে যাব!

ছয়. বড় বইগুলো লিখে তিনি ভালই করেছেন। মনে হয়, না লিখলে পাঠক ভাবত বড় বই তিনি লিখতেই পারেন না। বড় বইগুলোও সমান সুখপাঠ্য।

সাত. সবচেয়ে বড় ঘটনা– তাঁর অনাবিল সেন্স অফ হিউমার। আমাদের এই দুঃখকষ্টের জীবনে কিছুক্ষণ আমরা ফুরফুরে নিমগাছের বাতাস খাই। ঠোঁটের হাসি বজায় থাকে। 'এ পেন দ্যাট ক্যান মেক ইউ স্মাইল ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট পেন অফ অল।' পশ্চিমা সাহিত্য বিচারের এই বাণীর হিসেবে তাঁর কলম আমাদের সকলের চাইতে শক্তিশালী।

আট. মিডিয়া তাঁকে সাহায্য করেছে। বিশেষত টেলিভিশনে তাঁর নাটকগুলো। অসাধারণ নাট্যক্ষমতা। আমি তো মনে করি তিনি নিজেই পাতার বাঁশির যাদুকর। সামান্য জিনিস থেকে কী ভাবে তিনি আনন্দ সৃষ্টি করেন! তিনি মিডিয়াকে জয় করেছেন। মিডিয়া তাঁকে ছাড়েনি। জয় করবার জন্য যে শক্তি বা ক্ষমতার দরকার সেটা তাঁর ছিল।

নয়. অতিপ্রাকৃত গল্পের মাস্টার তিনি। এ জিনিস বড়দেরও কতটা আনন্দ দিতে পারে তাঁর প্রমাণ তাঁর লেখা অসংখ্য অতিপ্রাকৃত গল্প। আমি তাঁকে ভালবেসে কুড়িটি অতিপ্রাকৃত গল্প দিয়ে একটি বই করছি। অনেকগুলো তাঁর শোনা। পছন্দ করেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে আমার পথিকৃৎ। এ ব্যাপারে আমি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

দশ. বেশ কিছু দুর্লভ সিনেমা সৃষ্টি। *ঘেঁটুপুত্র কমলার* সাহসিকতা আমাকে বাকরুদ্ধ করেছে। এ হয়তো হাওড় অঞ্চল থেকে চলে গেছে কিন্তু সারা পৃথিবীতে 'চাইল্ড পর্নো' আজকের দিনের একটি ভয়াবহ সমস্যা– নানারকম আইন পাশ করেও যা ঠেকানো যাচ্ছে না। আবার শাপলা বা পদ্মদীঘি বা বৃষ্টির ঘটনার যেসব চিত্র ক্যামেরায় শিল্প সৃষ্টি করেছে কে তাকে ভুলে যাবে? কুসুম একা যখন নৌকায় বসে থাকে সে সৌন্দর্যের কী কোন তুলনা আছে? এই অসাধারণ সৌন্দর্যবোধ তাঁকে নুহাশ পল্লি ত বাগান করতে সাহায্য করেছে। সেইসব বাগানে আর দীঘির নৌকা দেখে আমার কান্না পেয়েছে। 'আসলে সৌন্দর্য আর মানবতা আমাকে অশ্রুসিক্ত করে'– এ কার কোটেশন বা বাণী ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে আমার বেলায় প্রযোজ্য।

এগারো. বই ব্যবসাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তিনি। একজন লিখিয়ে যে নিজেই একটি বই ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যায় সেটি কে কবে ভেবেছিল? তিনি দোকানের শোভা হয়ে থেকেছেন চিরকাল। লন্ডনে *সঙ্গীতার* এক তাক বইয়ের সামনে যখন দাঁড়াই, আমার চোখ ভিজে যায়। যার তলায় রাখা আছে আমার বই। দোকানের মালিক সেদিন আমারই মত ভেজা চোখে বলেছিলেন– আপা স্যার তো চলে গেলেন। আমরা দু'জন কেউ কথা বলতে পারিনি।

বারো. সাহিত্য করতে গিয়ে যেসব অলংকার অনেক সময় লেখায় চলে আসে তিনি মোটামুটি স্লে সব থেকে মুক্ত। সাধারণ পাঠক পায় মুক্তির স্বাদ। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছেন বলে একটা সোজাসাপটা বা স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ব্যাপার ছিল তাঁর। আমাকে বলতেন– ভাষা সহজ করতে হবে। জটিল ভাষার দিন শেষ।

তের. অশ্লীল বলতে আমরা যা বুঝি সেসব নেই তাঁর লেখায়। *লীলাবতীর* কিছু আপত্তিকর শব্দ ব্যবহারই তাঁর সাহিত্যজীবনের বোধকরি সবচেয়ে অশ্লীল ব্যাপার। এটি আমার মত। পাঠক ধরবার কাজটি করতে ওই পথে পা বাড়াননি তিনি। সুড়সুড়ি দিয়ে যৌন চেতনা জাগিয়ে দেননি। বলেছিলাম– কী ব্যাপার? নগ্ন নারীর এইসব ব্যাপার আপনি পরিহার করেছেন মনে হয়। মেয়েটি ব্লাউজের বোতাম লাগাল আর ছেলেটা সিগারেট খেতে লাগল। শেষ! তিনি কেবল হা হা করে হেসেছিলেন। উত্তর দেননি।

চোদ্দ. চমৎকার কিছু ছোটগল্প। *জীবনযাপন* গল্পের শেষ অংশ 'আমি ভিজে গেছি আমার সিগারেট ভেজেনি' কেন আমাকে অশ্রুসিক্ত করে বলতে পারি না। কিংবা সেই উলঙ্গ লোকটি মুক্তিযুদ্ধের দিনে যাকে পাকবাহিনী উলঙ্গ করেছে কিন্তু সেই মানুষ যখন মাথা সোজা করে দাঁড়ায় তখন তাঁর মাথা কী আকাশ ছোঁয় না? সকল মুক্তিযোদ্ধার মাথাই কী সেদিন আকাশ ছোঁয়নি?

পনের. তাঁর স্টাইল তাঁর নিজস্ব। এইটি কারো পক্ষে নিজের করে নেওয়া সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। এই শৈলী তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ।

ষোল. কিছু অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি। মিসির আলির প্রজ্ঞা ও রহস্যময়তা আর হিমুর সরলতা। *মিসির আলি সমগ্র* আমাকে ক্লান্তিহীনভাবে ঢাকা থেকে লন্ডন নিয়ে গিয়েছিল। বই থেকে যখন চোখ তুলেছি তখন লন্ডন নামবার সংকেত এসে গেছে। এমনি করে পাঠক ধরে রাখবার যাদুকর আর ক'জন হতে পারেন? ফিরে এসে টেক্সট করে বলেছিলাম– এই দীর্ঘ যাত্রা বুঝতেই পারিনি। কারণ আপনার মিসির আলি। তিনি কেবল উত্তরে লিখেছিলেন– থ্যাংক য়ু। আমার এক চুপচাপ জন্মদিনে বইটি তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

সতের. তাঁর ভ্রমণকাহিনি অনাবিল আনন্দের। আমি খুব মন দিয়ে পড়ি।

আঠার. তাঁর লেখা আমার সবচেয়ে প্রিয় বই– *আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই*। এইটি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি এসবের ক্যাটাগরিতে পড়ে না। যে পাঠক এর স্বাদ চাখেননি তাঁকে চাখতে অনুরোধ করি। অনেককে পড়িয়েছি– যাঁরা পড়বার পর বলেছেন, এই বইয়ের কথা তো আমি জানতাম না। বলেছি– পড়বার পর ফেরত চাই। এখনো আমার শেল্ফের তাকে বইটি সযতনে রাখা আছে। আশা করছি প্রকাশক নতুন করে আবার বইটি ছাপাবেন।

ভারতের *দেশ* ও *আনন্দবাজার পত্রিকার* পুজো সংখ্যায় পর পর সাত বছর তাঁর উপন্যাস গেছে। এরপর তিনি নিজে থেকে আর লেখেননি। কারণটা বলেছিলেন– এখন আমি মনে করতে পারছি না। তাঁর মা শ্রদ্ধেয় আয়েশা ফয়েজ একজন অসাধারণ নারী– যাঁর স্নেহ ভালবাসা আমার স্মৃতিতে অম্লান। এই রচনায় নয়– অন্য কোন রচনায় আমি তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাব। আবার বলি, বারবার বলি– হুমায়ূন আহমেদ– অসাধারণ, অনন্য, একক।

সালেহা চৌধুরী লন্ডনপ্রবাসী কথাসাহিত্যিক

বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতি
হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা ১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

BANGLADESH-BHARAT SAMPRITEE PARISHAD
বাংলাদেশ ভারত সম্প্রীতি পরিষদ
নাহার পসাজা, ৯ম তলা, ২৬ সোনারগাঁও রোড
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০১৬৭৬ ০৪৮৫৭২
ই মেইল
bangladesh-bharat-sampriti@yahoo.com
ওয়েবসাইট: http://www.shampritee.org

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India
ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

খোলা নাকি বন্ধ দুয়ার

খায়রুল আলম সবুজ

বন্ধ ঘরের কোথায় কি আছে
কি করে বলব বল কোথায় শতাব্দিপ্রাচীন কারুময় পালঙ্ক
কোথায় শ্বেত পাথরের টেবিল সোনালি কলম
অথবা গন্ধরাজের ফসিল পড়ে আছে,
কি করে বলব বল
যে-ঘর কোনদিন দেখিনি চোখে, খুলিনি নিজের হাতে
কি করে বলব বল–
আমি তার কতটুকু জানি।

কোন্ দেয়ালে কোন্ পুরাতন ছবি
কি করে জানব বল কে কার ভাবে অসদ্ভাবে ছিল
দোলনচাঁপা কালো হয়ে গেছে কবে
সময়ের বিষে বিষে
অথবা
কোন্ কোণে দ্রোণী কাত হয়ে ঢেলেছিল জল কোনকালে
কোন্খানে কার স্মৃতি পুরাতন রক্তের মত লেগে আছে
আমি তার কতটুকু জানি
কি করে বলব বল– না খুলে দুয়ার, না দেখে চোখে

তুমি তো নিজ হাতে খোলনি দুয়ার
একবারও দেখোনি চোখে যা আছে দেখার
কি করে জানবে বল কে কি, কোথায় কি আছে।

ব্যক্তিগত জিরো আওয়ার

খোরশেদ বাহার

হেমন্তের এই সকালে কুয়াশা আমার শরীর ছুঁয়ে যায়
আমি লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছি
যেমন তুমিও দাঁড়িয়েছিলে চৌধুরীদের বাড়ির গেটে।
তখন ছিল রাসউৎসব, আজ আমি একটি ভিসার জন্যে।

কতদিন দেখা হয়নি দু'জনের।
এবার দেখা হলে বলতাম
লাল পাহাড়ের দেশ আর কতদূর সুনীলদা?
জানতে চাইতাম হাজার না জানা কথা।

মহারাজের গালে পোঁতা গোলাপ গাছের খবর
ক্লান্ত অন্ধকারে চোখের জলে সাঁতার কাটা মাছের
নরম জলের মত শরীরের কত কত গভীরে আঁধার থাকে।

কিংবা শেষ পর্যন্ত কি অরুন্ধতির ভালবাসা মিলল?
কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ বাসস্টপে, এই অবেলায়?
তিন মিনিট নয়, ঘড়ির কাঁটা পেরিয়ে গেছে তিন যুগ।

এবার সত্যি সত্যি তোমার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম
কি নিদারুণ পাশা খেলায় তুমি হেরে যাচ্ছ অবিরাম
পুরোহিতের কাছে।
এই সময়ে মনে কি পড়ে নীরার মুখ
বেলগাছিয়ায় নেমে গেল যে নম্র নেত্রপাতে
ভাঁটফুলের গন্ধ মাখা শরীরে
কৌতুকময় বিষণ্ণতায় ভরা চোখ
তার চিবুকে কি কোন তিল ছিল?

আমি ভিসার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।
ভিসা পেলে মিলবে এমন সব প্রশ্নের উত্তর।
এখনো কি বাড়ি ফেরার পথে বাড়ি হারিয়ে যায়?
বাতাসে সাঁতার দিয়ে ব্যক্তিগত জাতীয় সঙ্গীত
এখনো কি ভাসে নিরুদ্দেশে?
শিকেয় তুলে রাখা তোমার হাজার গোপন কথা
জানা কি হবে না সব একজীবনে?
দেখা কি হবে কালের মন্দিরে নীরার সাথে?
যে তুমি পিতামহের দীর্ঘশ্বাসকে বন্দী রেখেছ কাঠের সিন্দুকে
যে তুমি বেঁচে থাক শুধু গোলাপের পাপড়ি গুণে গুণে।

হঠাৎ টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে তোমার একাকী সাদাকালো ছবি।
চোখের কোঠর থেকে বর্ণমালা কেমন ফিকে হয়ে আসে।
তারই ফাঁকে আমি নিমেষে পড়ে ফেলি তোমার সব না লেখা কবিতা
তখন আনন্দগুলো হলুদ রঙের বৃষ্টি ঝরায়
সে বৃষ্টির করুণ ধারায় দুপুর গড়িয়ে যায়
ভেসে যায় চোখের জলে বাংলার সমস্ত শহর।

এবার কিন্তু ঈশ্বর-প্রতিমা সবাই দিয়েছে কথা
কিছুই বন্ধক চায় না ওরা শুধু তোমাকে ছাড়া
মঞ্জুর তোমার ব্যক্তিগত জিরো আওয়ার।
পিস হেভেনের হিমগাড়িতে,
ফুলের শয্যায় ধীরগতিতে
পিছে ফেলে হাজার আমিকে
সুনীলদা একবার গিয়েই দেখ না
অমরত্ব তোমার পায়ের কাছে, শিয়রে বসে মা
মাইরি বলছি এবার যেন ঘুমিয়ে পোড়ো না।

বৃষ্টি ও মদিরা হয়ে এসো

হাসান হাফিজ

কাচের চেয়েও তুমি সহজেই ভেঙে যাও
নাম কী তোমার মেয়ে? ভালবাসা নও তুমি?
বৃষ্টির চেয়েও তুমি ছলাকলা ভাল জানো
আলোর চেয়েও বেশি ভালবাসো অন্ধকার
তোমার গহীনে ডুবি তোমার হৃদয়ে জ্বলি
আমি এক নিরুপায় চিতাবাঘ, ক্ষুধার জ্বলুনি
আমাকে পোড়ায় দহে, নিরম্বু সে উপবাসে
নিঃসঙ্গ পুড়তে থাকি ব্যথাতুর বেহায়া বিচ্ছেদে

আমি আর ভাঙতে চাই না, যথেষ্ট হয়েছে
আমি আর পুড়তে চাই না, এবার অন্যকে
পোড়ানোর ক্ষমতা অর্জিত হল, সুতরাং
প্রয়োগের উপযুক্ত মৃত্তিকা বা ক্ষেত্র চাই
এসো তুমি বৃষ্টি আর আলতো মদিরা হয়ে

সৎকার

দ্বিজেন্দ্রলাল আচার্য

মাকে পোড়াতে এসে দেখি দাহকাঠ নেই।
অন্ধকার– ডোমের কুটির।

তবে, তাকে জলে কি ভাসাব?

মা তো জল ভালবাসে–
শীর্ণ নদীটির মত ভাঙাগড়া... গড়াভাঙা–
সারাটি জীবন।

তবে তাকে জলেই ভাসাই–

ভেসে যাক অন্তহীন সমুদ্রের দিকে...

দ্বিজেন্দ্রলাল আচার্য ভারতের কবি

না-খোলা চিঠির মত

দেবী রায়

চোখের সামনে না-খোলা চিঠির মত বিস্ময়কর,
রহস্যময়!
দুরু দুরু হৃদয়ে বেজে ওঠে অব্যক্ত মিশ্র অনুভূতি!
দেরাদুন মুসৌরি– থিম্পুতে যেমন দেখেছিলাম–
একদা, সেই ভেজা-ভেজা মেঘ তীব্র ঠাণ্ডা
ধোঁয়া...! এ এক বিস্ময়কর পৃথিবী, পুণ্যধাম!

ঐ দূর পাহাড়ে ছড়িয়ে আছে দুরন্ত শিশুর মত
রোদ!

দেবী রায় ভারতের কবি

শূন্যে শুয়ে আছি

আতাহার খান

শূন্যে শুয়ে আছি নাকি শূন্য আমার ভিতরে শুয়ে আছে
বুঝতে পারি না, অস্পষ্ট ধাঁধার মধ্যে শুধু
হাবুডুবু খাচ্ছি, একবার মনে হয় আমি
বিশাল হা-করে শূন্য গিলে খাচ্ছি– আর একবার
মনে হয় শূন্য আমাকে আমূল গিলে খাচ্ছে– কেন
বার বার এরকম মনে হয়? আমি তো জানি না
সীমাহীন অথৈ শূন্যতায় ডুবে গেলে কেন খোঁজে মানুষ বাঁচার পথ!

মাঝে মাঝে মন খুব ভেঙে পড়ে, অবাক বিস্ময়ে দেখি
আমি শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি একাকী
হাল্কা মেঘ হয়ে চারদিক, ভূ-পৃষ্ঠের
আকর্ষণশক্তি কাছে টেনে নিতে পারে না আমাকে,
সম্পর্কের নিবিড় বাঁধন এক এক করে ছিঁড়ে যায়,
বাড়ে শুধু অনতিক্রম্য এক নির্জনতা, খাঁ-খাঁ শূন্যে
বিন্দু বিন্দু আলো হয়ে ভাসি একা–
দুই চোখে বয়ে নিয়ে নিঃসঙ্গ কষ্টের দাগ–
ভাল নেই আমি, মন এলোমেলো,
এখানে আমার নেই কোন সুখবর–
আছে পড়ে সযত্নে লালিত কিছু স্মৃতিকণা,
রঙের বিচিত্র মোহনীয় ছবি,
এইসব আমার যা কিছু আছে সব
আমাকে একাকী রেখে চলে যায় দূরে, বহু দূরে।

রহস্যের এই জটিল পাহাড় ভেদ করে কেন
আমি স্থির সিদ্ধান্তের দিকে এগুতে পারি না?
কেন মনে হয় খাদের ভিতর জমে থাকা
নির্জন শূন্যতা ছাড়া নেই
এ জীবনে আর কোন উজ্জ্বল সঞ্চয়,
ব্যর্থ আর ক্ষুদ্র এই আয়ু শূন্যতায় হামাগুড়ি খায়,
আর আমি শরতের অস্থির শিশির ফোঁটা হয়ে ঝরি
এলোমেলো মাটির ওপর, জানা নেই কিছু,
শুধু জানি এই মন বয়ে আনে ঝড়ের তাণ্ডব,
কখনো বা শূন্যের ভিতরে সময়ের কান্না হয়ে ভাসে অর্থহীন!

তখন শূন্যতা পূরণের কথা আমার থাকে না মনে,
আমি ভুলে যাই, ভাবি– একমাত্র শূন্য সত্য,
শুরুর আর শেষ ছাড়া এর নেই অন্য কিছু, শূন্যপথ বেয়ে
শূন্যদৃষ্টি শুরু করে হাঁটাহাঁটি অবিরাম, শুরু হয়
আবার নতুন করে দুঃখ আর সুখে পথচলা, তাই শূন্যে
বিরামবিহীনভাবে চলে রূপ বদলের খেলা, আমিদ্রুত
ঢুকে পড়ি শূন্যের গহ্বরে, নেপথ্যে নীরবে পড়ে থাকে অসীম সময়!

ভ্রমণ

প্রাচীন সভ্যতার মুখোমুখি

জাহানারা পারভীন

৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বকশি বাজারে অস্থায়ী আদালত। সকাল থেকে লাইভে আছি। হঠাৎ ভারতীয় হাই কমিশনের কাউন্সিলর সুজিত ঘোষের ফোন। সুজিতবাবু জানান, এ মাসের শেষে বিহারে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথিরা আসবেন। জানতে চান বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি যেতে আগ্রহী কী-না। রিপোর্টিং করতে এবছর দু'বার ভারতে গিয়েছি। মে মাসে লোকসভা নির্বাচন কাভার করতে দিল্লি, জুন মাসে নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের মামলার প্রধান আসামী নূর হোসেনের গ্রেপ্তারের সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়েছি কলকাতায়। এবার শুধুই ঘোরাঘুরি।

২৪ সেপ্টেম্বর সুজিতবাবু আমন্ত্রণপত্রসহ পুরো সম্মেলনের বিস্তারিত কপি বুঝিয়ে দেন। প্রতিদিন কোন কোন জায়গায় যাওয়া হবে, কখন আলোচনা– সারাদিনের সফরসূচি। তিনি জানান, সেখানে বৌদ্ধদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখার সুযোগ হবে। নেওয়া হবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর কাছ থেকে ধারণা পাই, এই সফর হতে যাচ্ছে আমার পেশাদারিত্বের বাইরে এক ভিন্ন সফর। সাধারণত কাজের বাইরে খুব একটা কোথাও যাওয়া হয় না। যত ঘোরাঘুরি, সব সাংবাদিকতার জন্য। ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে জেট এয়ারের ফ্লাইটে দিল্লি যাই। বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন আয়োজকদের কয়েকজন প্রতিনিধি। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অতিথিদের নাম তাঁদের হাতে। গাড়ি করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় অশোক হোটেলে। সেখানে অভ্যর্থনা। ফুল, মালা, কপালে তিলক আর ঠাণ্ডা পানীয়। বিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লি শহর ঘোরাতে।

ট্যুরিস্ট বাসে অনেক অতিথি। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এসেছেন। আমেরিকা ইংল্যান্ড, কানাডা, ভূটান, ফ্রান্স, কোরিয়া, রাশিয়া, জার্মানি বলতে গেলে সব দেশের নাগরিকই ছিল। কোন কোন দেশ থেকে ছ'জন, কোন দেশ থেকে পাঁচজন। সব দেশের দল ছিল। মোট একশো চল্লিশ সদস্য। এদের কেউ শিক্ষক, কেউ সাংবাদিক, কেউ লেখক, কেউ ট্যুর অপারেটর, কেউবা ধর্মগুরু। পুরো সফরে যেখানেই গেছি পাঁচটি ট্যুরিস্ট বাসে ঘুরেছি। প্রতিটি বাসে ছিলেন একজন গাইড যিনি আমাদের নানা তথ্য জানিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে আরো একজন আছেন ইফতেখার আহমেদ, ট্যুর অপারেটর। বিকেলে আমাদের ঘোরানো হয় ভারতের রাজধানী দিল্লি। দেখানো হয় কুতুবমিনার, ইন্ডিয়া গেট, প্রেসিডেন্ট হাউস, সাউথ ব্লক, রামকৃষ্ণ মন্দির।

পরদিন সকালে দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে রওনা দিই বিহারের পথে। দিল্লি থেকে বিহারের দূরত্ব এক হাজার একশো সাতাশ কিমি। সড়কপথে পনেরঘণ্টা, আকাশপথে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের পথ। আমরা যখন বিহারে পৌঁছুই তখন দুপুর। চারপাশে শরতের ঝকঝকে আকাশ। সাদা মেঘের ভেলায় ভাসতে ভাসতে, ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ ও রোদের লুকোচুরি দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই বুদ্ধগয়ায়। এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ চার্টার্ড বিমানের সবটাই আমাদের দখলে। বুদ্ধগয়া এয়ারপোর্ট বেশ ছোটখাটো। অনেকটা ঘরোয়া। বিমানবন্দরে নামার পরই শুরু হয় অভ্যর্থনা। ফুল, মালা, কপালে তিলক পরিয়ে আমাদের বরণ করে নেন বিহারের স্থানীয় প্রশাসন। বিমানবন্দরে অপেক্ষায় ছিল বৌদ্ধশিশুরা। তাদের প্রার্থনা সংগীতে অন্যরকম হয়ে ওঠে পরিবেশ।

ট্যুরিস্ট বাসের দু'পাশে বুদ্ধগয়ার অবারিত প্রকৃতি। বাংলাদেশের যে কোন মফস্বল শহরের মতই। তবে অনেকটাই শান্ত, নির্জন। বিহার রাজ্যের গয়া জেলার একটি শহর বুদ্ধগয়া। জনসংখ্যা চল্লিশ হাজার। জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ পুরুষ। নারী ৪৬ শতাংশ। সাক্ষরতার হার ৫১ শতাংশ। বিহারের এই শহরটি বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত এক ঐতিহাসিক শহর। গৌতম বুদ্ধের কর্মভূমি। গৌতম বুদ্ধ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বিহারে। নেপালের কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র রাজকুমার সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যপাট ত্যাগ করে বুদ্ধগয়ায় আসেন। তখন এ শহরের নাম ছিল উরুন্নবেলা। এখানে নিরঞ্জন নদীর তীরে বসে তিনি ছ'বছর ধ্যান করেন। ৫৮ খ্রিস্টাব্দে এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যে অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে নির্বাণ লাভ করেন তার নাম হয় বোধিবৃক্ষ। যেখানে বসে ধ্যান করেছেন সিদ্ধার্থ, সেখানে নির্মিত হয়েছে এক নান্দনিক মন্দির। বিকেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় সেই মহাবোধী মন্দিরে। উচ্চতা একশো আশি ফুট। নীচের দিকে ব্যাস চল্লিশ ফুট। পাথুরে কারুকাজ করা মন্দিরের নির্মাণশৈলী দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রতিদিন ভারত ও বিশ্বের নানা দেশ থেকে পর্যটকরা এই ঐতিহাসিক মন্দির দেখতে আসেন। মন্দিরের পেছনেই অশ্বত্থ গাছ। দুই হাজার পাঁচশো বছর আগে যার নীচে ধ্যান করে নির্বাণ লাভ করেছেন সিদ্ধার্থ, হয়ে উঠেছেন গৌতম বুদ্ধ। প্রতিবছর তার নির্বাণ লাভের রাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এখানে আসেন। বোধিবৃক্ষের শেকড় সুগন্ধি জল ও দুধ দিয়ে ধুইয়ে দেন। গাছের নীচে ছড়িয়ে দেন ফুল, সুগন্ধি ধূপ। নানা ধর্মীয় আয়োজনে স্মরণ করেন বুদ্ধকে। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা। সেই বৃক্ষের নীচে হাজারো ভক্ত বসে আছেন গেরুয়া পোশাকে। চলছে সান্ধ্য প্রার্থনা। অশ্বত্থ গাছের দিকে তাকাই। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু একটি অশ্বত্থ। সান্ধ্য বাতাসে গাছ থেকে পাতা নয়, প্রার্থনারত ভক্তদের ওপর যেন ঝরে পড়ছে মহামতি বুদ্ধের আশীর্বাদ। এই অশ্বত্থ অনেক রোদ, ঝড়, অত্যাচার সয়েছে। পড়েছে অনেক শাসকের রোষানলে। কেটে ফেলা হয়েছে। উপড়ে গেছে ঝড়ে। মূল বৃক্ষটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শ্রীলংকায় সম্রাট অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা যে চারাটি নিয়ে গিয়েছিলেন তারই একটি চারা এখানে রোপণ করা হয়। সেটি এখনো টিকে আছে। অশোকের শেষ বংশধর মগধরাজ গাছের চারদিকে উঁচু পাথরের দেয়াল তুলে দেন যেন গাছটি কেউ কেটে ফেলতে না পারে। মহাবোধি মন্দিরের পাশাপাশি সেদিন আমাদের দেখনো হয় সুজাতার কুটির। গৌতম বুদ্ধ যখন ধ্যান করতেন সুজাতা তাকে পানি ও খাবার খেতে দিয়েছেন। পাশাপাশি দেখে আসি বুদ্ধের আশি ফুট দীর্ঘ ভাস্কর্য।

সন্ধ্যায় যাই অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে। ভারতের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সেখানেই আয়োজন করা হয় তিনদিনের আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের। সেখানে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার। বিমানবন্দরে দেখা সেই শিশুদের সঙ্গে দেখা হয়। এরা পুরোটা সময় মঞ্চে থেকেছে। নাচ, গান, বুদ্ধের বাণীর সঙ্গে নানা পরিবেশনায় সুন্দর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভরে যায় দেশীবি দেশী অতিথিদের মন। সেখানে কথা হয় ভারতের পর্যটন সচিব পারভেজ দেওয়ানের সঙ্গে। বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে আন্তরিকভাবে কথা বলেন এই আয়োজন নিয়ে। তিন হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য থাকা বিহারসহ ভারতের ঐতিহাসিক বৌদ্ধস্থাপনাগুলোর সঙ্গে পর্যটকদের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের মাঝে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি তৈরি করতেই ভারত সরকার এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে বলে তিনি জানান।

পরদিন সকালে ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হয় সম্মেলনের মূল আনুষ্ঠানিকতা। দুপুর পর্যন্ত চলে আলোচনা, মতবিনিময়। অংশ নেন

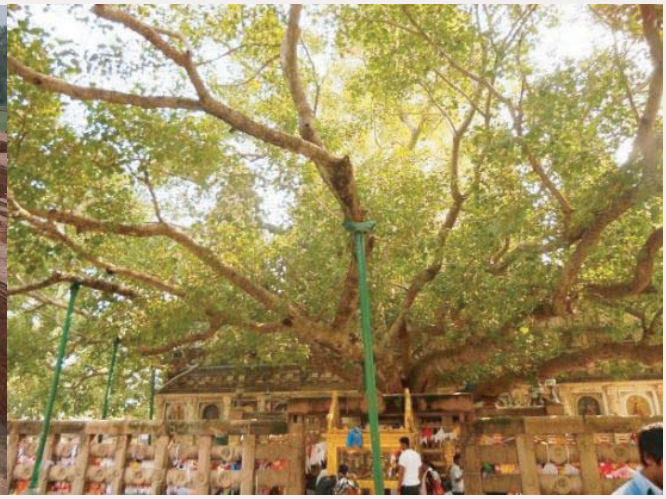

বিহারের বিশিষ্টজনেরা, বিদেশ থেকে আসা অতিথিরা। বিহারের মুখ্যসচিব অঞ্জনি কুমার সিং, বিহারের পর্যটনমন্ত্রী ড. জাভেদ ইকবাল আনসারী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝিসহ বক্তৃতা করেন বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বৌদ্ধের দর্শন, তাঁর শান্তির বাণী, তাঁর আদর্শের কথা বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে ভারতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের একসঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা জানিয়ে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন বৌদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলোর প্রতি দর্শনার্থীদের আগ্রহ আরো বাড়বে।

বিকেলে যাই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাটনা থেকে পঞ্চান্ন মাইল দূরে অবস্থিত নালন্দা ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। এর প্রতিষ্ঠাতা গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্ত। পরবর্তীকালের শাসকরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ৪২৭ থেকে ১১৯৭ অব্দের সময়কাল এর বিকাশের সময়। বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায় দুই হাজার শিক্ষক, দশ হাজার ছাত্র ছিল। আটটি বিশাল চত্বরজুড়ে ছিল দশটি মন্দির, শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রাবাস, ধ্যান করার কক্ষ, পাঠাগার, বাগান, দীঘি। নয়তলা ভবনে ছিল পাঠাগার। সেখানে তৈরি হত পাণ্ডুলিপি। সে সময় জ্ঞানবি জ্ঞানের সব শাখার চর্চা হত এখানে। মূলত বৌদ্ধধর্মের গবেষণা ও ধর্মচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা হলেও এখানে পড়ানো হত হিন্দুদর্শন, বেদ, ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানসহ অনেক বিষয়। কোরিয়া, জাপান, চিন, তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া, পারস্য, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত এখানে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ দর্শন বলে আজ যা পরিচিত তার বড় অংশ নালন্দা থেকে এসেছে, বৌদ্ধ দর্শনের অন্যান্য রূপ যেমন মহাযান যা ভিয়েতনাম, চিন, কোরিয়া এবং জাপানে অনুসরণ করা হয়, তা শুরু হয়েছে নালন্দাতেই।

গৌতম বুদ্ধ একাধিকবার এসেছেন নালন্দায়। থেকেছেন, আলোচনা করেছেন ধর্ম নিয়ে। নালন্দা আক্রমণের শিকার হয় তিনবার। প্রথমবার এশিয়ার যুদ্ধবাজ হানাদাররা, দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারী বাংলার শাসক শশাঙ্ক, শেষবার ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নালন্দা আক্রমণ করে ধ্বংস করেন। তখন অনেক ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়, জীবিতদের সবাই পালিয়ে যান। এই ঘটনাকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের সূচক হিসেবে দেখা হয়। খিলজি এভাবে প্রাচীন সভ্যতা পুড়িয়ে ত্রাস ও নির্মমতার মাধ্যমে এই অঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্মের শেকড় উপড়ে এখানে শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। নয়তলা ভবনের পাঠাগারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এত বেশি বই ছিল যে বইগুলো পুড়ে ছাই হতে একমাস সময় লাগে। গাইডের কাছে নালন্দার কথা শুনতে শুনতে, পনের হাজার বর্গ কিমি খনন করা জায়গায় লাল ইটের স্থাপনা, ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে টিকে থাকা ক্ষয়িষ্ণু ভবন, বিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে ওঠা চিহ্ন দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরনো দিন, ভিক্ষুদের প্রার্থনা, ছাত্রদের আনাগোনা, বাগানে ঘোরাঘুরি, পাঠাগারে পাঠমগ্ন শিক্ষার্থী, আর সেই নয়তলা ভবনের পাঠাগারের গ্রন্থপোড়া ছাই। আগুনের ধোঁয়ায় যেন ঝাপসা হয়ে আসে চোখ।

প্রাচীন নালন্দা থেকে কিছুটা দূরে রাজগীরে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আটশো বছর পর এ বছরের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নতুন পরিসরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। পনেরজন শিক্ষক ও বারোজন ছাত্র নিয়ে নতুন একটি ভবনে যাত্রা শুরু হয়েছে সেই পুরনো ইতিহাসের। সন্ধ্যায় রাজগীরে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার। খোলা আকাশের নীচে বিহারের ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান ও নাটকের পরিবেশনায় তারা ঝলমল সন্ধ্যাটা হয়ে ওঠে আরো আলোকিত।

পরদিন সকালে সম্মেলন কেন্দ্রের মিলনায়তনে আবারো আনুষ্ঠানিকতা। তারপর সদলবলে বুদ্ধগয়া বিমানবন্দরে। সেখান থেকে প্রাচীন শহর, ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে খ্যাত বেনারস। আকাশপথে বেনারস মাত্র ত্রিশ মিনিটের পথ। বেনারস বিমানবন্দরে পৌঁছেও একই অভ্যর্থনা। মালা দিয়ে বরণ করা হয় অতিথিদের। প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতীয় রীতিতে অতিথিবরণের কায়দার মুগ্ধ ইউরোপ, আমেরিকার মানুষেরা। সন্ধ্যায় নিয়ে যাওয়া হয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান গঙ্গার ঘাটে। এতজন বিদেশী নাগরিকের আগমন উপলক্ষ্যে ঘাটে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ঘাটের চারপাশে সতর্ক পাহারায় থাকে বেনারসের পুলিশ। ফুলে ফুলে সাজানো হয় ঘাট। মুগ্ধ হয়ে দেখি গঙ্গার ঘাটের সান্ধ্যআরতির প্রার্থনা পর্ব।

পরদিন উত্তর প্রদেশে শেষ দিন। বেনারস থেকে তের কিমি উত্তর পূর্বের সারনাথ উদ্যানে যাই। সারনাথেও মাটি খনন করে আবিষ্কার করা হয়েছে প্রাচীন মঠ স্থাপনা। এখানে গৌতম বুদ্ধ প্রথম ধর্ম নিয়ে ভেবেছিলেন। সারনাথে রয়েছে বৌদ্ধমন্দির, উঁচু স্তম্ভ ও আরো কিছু স্থাপনা। সারনাথ থেকে সরাসরি চলে আসি বেনারস এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে দিল্লি। আবারো অশোক হোটেল। এই ক'দিনে মাল্টার জন বাসুটিল, আমেরিকার সাংবাদিক মিল্ডি পোডার, ইতালির ফটোগ্রাফার ভ্যালেন্টাইন চিডো, ব্রাজিলের মারিয়া, ভূটানের ট্যুর অপারেটর লিডেন স্যাংগেই, রাশিয়ার মেয়ে এলিনা ভাতাকোভস্কি– কিভাবে যে আপন হয়ে উঠেছি! মনেই হয়নি আমাদের দেশ আলাদা, ভাষা ভিন্ন; আলাদা পরিবেশ ও সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা কিছু মানুষ মাত্র ক'দিনের ওঠাবসায় এতটা আপন হয়ে উঠেছে। শেষ দিনে সবাই ফিরে যায় সবার দেশে। দিলিস্ন থেকে পরদিন ঢাকায় ফিরে আসি। সঙ্গে করে নিয়ে আসি ভারত সরকারের উষ্ণ আতিথেয়তা, ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অসাধারণ কিছু স্মৃতি, চিরকাল মনে রাখার মত কিছু সৌহার্দের মুহূর্ত।

জাহানারা পারভীন
সংবাদকর্মী

কনসার্ট

পাঁচ দিনে দিল্লি জয়!

শারমিন সুলতানা সুমী

মিউজিকের কল্যাণে গত দু'বছরে বিভিন্ন উৎসবে অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। ইন্ডিয়া মিউজিক উইক্স এ অংশ নিতে ভারতে গিয়েছি ২০১২ সালে, জাফনা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে শ্রীলংকায় গিয়েছি, গিয়েছি বিশ্বের শান্তির দেশ হিসেবে খ্যাত নরওয়ের ছ'টি শহরে গান গাইতে। দেশকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার এ প্রচেষ্টায় এই পর্যন্তই যথেষ্ট খুশি এবং অনুপ্রাণিত ছিলাম আমরা। কিন্তু বছর শেষে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মৃদু পবন দাসের একটি ফোন *চিরকুট*কে: 'আমরা এ বছর সাউথ এশিয়ান ব্যান্ড ফেস্টিভ্যালে আপনাদের পাঠাতে চাই, আপনারা কি যেতে পারবেন?' এই পযন্ত শুনে খুশিতে মনে মনে তিন লাফ দিতে না দিতেই ওপাশ থেকে স্বভাবসুলভ বিনয়ী ভঙ্গিতে তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'সরি আপনাদের জানাতে দেরি করে ফেললাম... শুধু তা ই নয়, আপনাদের ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মানার্থে আরও একটি বিশেষ কনসার্ট করতে হবে'– আনন্দে শুধু লাফ নয়, এবার রীতিমত ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার মত অবস্থা! অনেক সম্মান এই স্বল্প সময়ে বিধাতা আমাদের দিয়েছেন। তবে একজন রাষ্ট্রপতির জন্য গান গাইতে যাওয়ার ঘটনা আমাদের জীবনে এই প্রথম! দেরি না করে মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানালাম এই বিশেষ সুখবর পাঠানোর জন্য। অতি উত্তেজনায় ওই সময়ের জন্য পুরো বিষয়টা ভাবা একটু কষ্টসাধ্য ছিল বটে, কিন্তু এখন তা কেবলই সুখস্মৃতি, বুড়ো বয়সে নাত্নি পুতিদের গর্ব করে বলার মত অবিস্মরণীয় এক ঘটনা। বাংলাদেশের *চিরকুট*, সবার ভালবাসার গান গাইল ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির জন্য, গান গাইল দিল্লিবাসীর জন্য আর দেশ, পরিবার বন্ধু বান্ধব, দেশের মানুষের জন্য বয়ে নিয়ে এল অনেক অনেক সুনাম, ভালবাসা আর শুভ কামনা!

৩ নভেম্বর ২০১৪ নির্ধারিত সময়ের আগেই দিল্লি এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাই আমরা। এয়ারপোর্টে নেমেই ভাবছিলাম, এই এখনই কেউ একজন এসে আমাদের নিয়ে যাবে 'ইবোলা' পরীক্ষা করাতে।

একজন এলেন ঠিকই কিন্তু 'ইবোলা' পরীক্ষা করাতে নয়, আমাদের সসম্মানে নিয়ে যেতে।

কোনরকম পরীক্ষাই যাতে না করতে হয় সে ব্যবস্থা করতে তিনি আমাদের সরাসরি নিয়ে গেলেন ডিপ্লোম্যাটিক জোনে, মানে এয়ারপোর্টের যে অংশটা দিয়ে সাধারণত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী, এমপি, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীরা গিয়ে থাকেন। ব্যাপারটা আমাদের কাছে রীতিমত অস্বস্তিকরই ছিল– অকল্পনীয় সম্মানপ্রাপ্তির অস্বস্তি। সেখানে ডেস্কে কর্তব্যরত ব্যক্তি আমাদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'রাষ্ট্রপতিকা গেস্ট হ্যায়!' গর্বে বুকটা যেন চওড়া হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আমরা সবাই সবার দিকে তাকিয়ে এই গর্বটা ভাগ করে নিলাম এরই ফাঁকে। একমিনিটের বেশি আমাদের ওখানে থাকতে হল না। গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বের হয়ে দিল্লির পথে চোখ বুলাতে বুলাতে আমরা রওনা হলাম ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির বাসভবনের উদ্দেশ্যে।

দূর থেকে দেখলাম রাষ্ট্রপতি ভবনের শিখরে পতাকা উড়ছে। এতদিন শুধু ছবিতেই দেখেছি বারবার। আমরা সবাই একটু নড়েচড়ে বসলাম। রাষ্ট্রপতি ভবনের ৩৫ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকতেই মনে হল জীবন সার্থক। বিশাল এক সাম্রাজ্যে যেন প্রবেশ করলাম। একে একে ছাড়ালাম মুঘল গার্ডেন, রাষ্ট্রপতি ভবন লাইব্রেরি, বিশাল বিশাল কয়েকটি মাঠ, ফুলের বাগান, রাষ্ট্রপতি ভবন অডিটোরিয়াম– সব ছেড়ে পৌঁছলাম রাষ্ট্রপতি ভবন গেস্ট হাউজ পিকক্ক এ। সেখানে ভিতরে ঢুকতেই কলিজা ঠাণ্ডা। প্রচ- বাতাসে হিজলগাছের পাতাগুলো অবিরাম শব্দ করে যাচ্ছে। বিরাট সবুজ লন আর সেই লনের চারপাশ ঘিরে ভবননিচয়। অসাধারণ! অতুলনীয়! শান্তি আর স্বস্তি মিলে মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন জায়গার দেখা পাওয়া যায়। এরপর যা আদর আপ্যায়ন, খাওয়া দাওয়া, পরিচর্যা– যাকে বলে রাজকীয় ব্যবহার! আর রাষ্ট্রপতি ভবন গেস্ট হাউজের লনে বসে জাতীয় দৈনিকগুলোতে নিজেদের ছবিসহ খবর পড়া– সত্যিই পাঁচদিনের জন্য যেন পুরো রাজার জীবন পেয়েছিলাম আমরা!

পরদিন রাষ্ট্রপতি ভবন অডিটোরিয়ামে প্র্যাকটিস করার সময় দেখা হল সাউথ এশিয়ান ব্যান্ড ফেস্টিভ্যালের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং ডিরেক্টর সঞ্জীব আগরওয়ালের সঙ্গে। ভীষণ আমুদে আর আশাবাদী একজন মানুষ। তিনিই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ভারত এবং পাকিস্তানের অসাধারণ দুই ব্যান্ড *মৃগয়া* এবং *জেব এ্যান্ড হানিয়ার* সঙ্গে। এই দু'টি ব্যান্ডের সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায়, তাঁরা শুধু অসাধারণ দক্ষ মিউজিশিয়ানই নন, মানুষ হিসেবেও প্রতিটি সদস্যই অত্যন্ত অমায়িক। তাই আমাদের এ তিন দেশের ব্যান্ডের একে অন্যের সঙ্গে মিশে যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। *চিরকুট-মৃগয়া-জেব এ্যান্ড হানিয়ার* মিউজিকে সেদিন কোন সীমানা ছিল না; ছিল শুধুই সম্প্রীতি, সৌহার্দ আর উষ্ণতা! সঞ্জীববাবুর পরিকল্পনায় রাষ্ট্রপতির জন্য বিশেষ উপহার হিসেবে ওইদিন আমরা তিন ব্যান্ড মিলে নিজ নিজ দেশের লোকগান মিলিয়ে একটি যৌথ ব্যান্ডগান তৈরি করি যেটি চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা অসাধারণ কম্পোজিশনে রূপলাভ করে। দুর্দান্ত অনুশীলনের পর ভীষণ অপেক্ষা নিয়ে আমরা সময় গুণতে থাকি কখন রাষ্ট্রপতিকে গানটা শোনাতে পারব। বলে রাখা দরকার, এর মধ্যেই রাষ্ট্রপতি কনসার্টে প্রবেশ করলে কে কোথায় কিভাবে দাঁড়াব, কতটুকু পারফর্ম করব, কিভাবে ফেরত যাব তার মিনিট, সেকেন্ড মেপে আমাদের মহড়া করালেন ভারতীয় সেনাবাহিনির একজন কর্মকর্তা। সত্যি বলতে কি, এত বেশি বাঁধাধরা নিয়ম্ম কানুনে আমরা কখনোই অভ্যস্ত ছিলাম না কিন্তু সেদিনের মহড়াটা আমরা ভীষণ উপভোগ করেছিলাম।

৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা। ভীষণ গুরুগম্ভীর পরিবেশ। নিরাপত্তাকর্মীদের ভীষণ তোড়জোড়। কাউকেই বাড়তি কথা বলতে দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে পদস্থ কর্মকর্তা, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব, আমন্ত্রিত অতিথিদের সমাগমে রাষ্ট্রপতি ভবন পরিপূর্ণ। আমরা ব্যান্ডগুলো যার যার জন্য নির্ধারিত কক্ষে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের সম্পর্কে একটা ছোট্ট ভূমিকাসহ ঘোষণা ভেসে এল, 'প্রেজেন্টিং *চিরকুট* ফ্রম বাংলাদেশ!' হঠাৎ করেই বুকের ভেতর কে যেন একটা হাতুড়ির বাড়ি দিল। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সামনে গাইতে যাচ্ছি! ভয়কে জয় করতে সবাই সবাইকে হাই ফাইভ দিয়ে এগিয়ে গেলাম মঞ্চের দিকে। বললাম, 'প্রিয় রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ব্যান্ড এবং বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনি আমাদের এখানে গান গাইতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এজন্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করছি। আমরা শুরু করছি এই উপমহাদেশের বিখ্যাত গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি কালজয়ী দেশপ্রেমের গান 'ধনধান্য পুষ্পভরা' দিয়ে। স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম শ্রোতাদের একদম পিছনের সারিতে বসা সম্মানিত রাষ্ট্রপতি মাথা নাড়লেন। তাঁকে পিছনে বসানো হয়েছিল যাতে গানের উচ্চনাদ তাঁকে বিব্রত না করে। মাথা নাড়া দেখে বুঝলাম গানটি তাঁর জানা। আমরা সমস্ত উৎসাহ দিয়ে গাওয়া শুরু করলাম এবং গান শেষ হতেই বিপুল করতালি! আবেগে মন ভরে গেল। হঠাৎ করেই দর্শকদের বড় আপন মনে হল। দ্বিগুণ উৎসাহে গাইলাম বাকি দু'টি গান– 'খাজনা' ও 'কানামাছি'। বারবার করতালি দিয়ে তাঁরা আমাদের আরও আপন করে নিলেন। এরপর একে একে গাইল *জেব এ্যান্ড হানিয়া* এবং *মৃগয়া*। সবার দুর্দান্ত নৈপুণ্যে সেদিনের রাষ্ট্রপতি ভবন যেন অন্য এক মাত্রা পেল যেটা হয়তো বা শুধু মিউজিক বলেই সম্ভব ছিল!

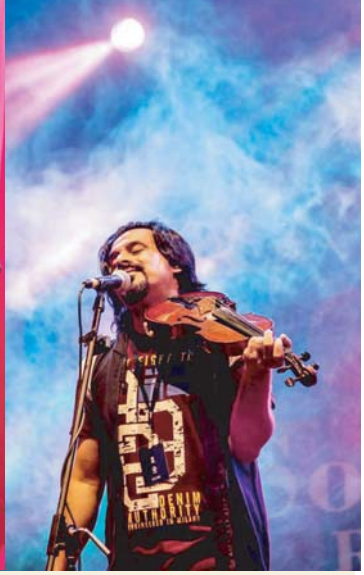

এরপর মহামান্য রাষ্ট্রপতি মঞ্চে উঠে এসে নিজ হাতে আমাদের শুভেচ্ছাস্মারক তুলে দিলেন। বোধকরি এ যাবৎকালে আমাদের পাওয়া এটাই সবচেয়ে বড় সম্মান। আমরা তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। এরপর হাস্যোজ্জ্বল রাষ্ট্রপতি সব ব্যান্ডের সঙ্গে ছবি তুললেন এবং অডিটোরিয়াম ত্যাগ করলেন। তাঁর চলে যাবার পর বিশাল হলে লাইভ মিউজিক আর খাবারের ফাঁকে একে একে আমন্ত্রিত অতিথিদের সবাই এসে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের তাঁদের ভাল লাগার কথা জানালেন। বললেন, আমাদের গান তাদের অসম্ভব ভাল লেগেছে এবং আমরা আবার যেন দিল্লি তে আসি তাদের গান শোনাতে। অনেকে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এলেন পরিচিত হতে, অটোগ্রাফ নিতে। পুরো পরিবেশটা আমাদের সঙ্গীতযাত্রাকে যেন মানসিকভাবে অনেক দূর এগিয়ে দিল। দিল্লির মানুষের এই অকৃত্রিম ভালবাসা পেয়ে আমরা সত্যিই অভিভূত, অনুপ্রাণিত এবং কৃতজ্ঞ!

এরপরের দিন মানে ৬ নভেম্বর ছিল শুধুই ঘোরাঘুরির। এত সুন্দর আর ঐতিহাসিক দিল্লি দেখার জন্য ওই একদিন কোনভাবেই যথেষ্ট ছিল না। তারপরও যতটুকু সম্ভব পুরো ব্যান্ড মিলে আমরা ঘুরেছি ইন্ডিয়া গেট এবং দিল্লির পথে পথে। শপিংয়ে গেছি খান মার্কেটে, দেখা করেছি দিল্লি তে আমাদের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। রাষ্ট্রপতি ভবনে সঙ্গীত পরিবেশনের চাপ তো কেটেছে আর ভয় কিসের! পরের দিন পুরনো কেল্লায় 'দি বিগ' অষ্টম সাউথ এশিয়ান ব্যান্ড ফেস্টিভ্যালের পরিবেশনা নিয়ে চাপ ছিল না, তবে উত্তেজনা ছিল অনেক বেশি। তাই ঘোরাঘুরিটা হল একদম মন খুলে!

৭ নভেম্বর সকালে পুরান কেল্লায় সাউন্ড চেক এবং সন্ধ্যায় পারফরম্যান্স। কি অদ্ভুত সুন্দর স্বর্গীয় এক পরিবেশ চারপাশে! আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে পুরো জায়গাটার আকাশ বাতাস। মাথার উপর বড় গোল চাঁদ যেন সেই পরিবেশে যোগ করল বাড়তি সৌন্দর্য। আজ এখানে পারফর্ম করবে ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের চারটি ব্যান্ড। বাকি দু'দিন নেপাল, ভূটান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ আরও কয়েকটি দেশ। মনে পড়ল এখানে দাপটের সঙ্গে পারফরম্যান্স করে গেছে আমাদের দেশের *বাংলা, নগর বাউল, এলআরবি মাইলস, সোলস, বোহেমিয়ান*! এবার আমাদের পালা! সবাই এক হলাম– কাঁপাতে হবে এই মঞ্চ! হলও তাই। আমরা একে একে পারফর্ম করলাম আমাদের সব মৌলিক গান– *যাদুর শহর, বন্ধু, নিরানন্দ. আমি জানি না, কানামাছি* আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *ধনধান্য পুষ্পভরা*। শ্রোতারা যেন পুরো সময়টা জুড়ে আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল! রীতিমত সবার নাম ধরে ধরে চিৎকার করতে লাগল পাগলের মত 'ইমন! ইমন!!', 'পাভেল!! পাভেল!!!' পুরো বিষয়টা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল! মুখের ভাষা হয়তো তারা বোঝেননি, কিন্তু গানের ভাষা বুঝতে তাদের যে কোন কষ্টই হয়নি সেটাই সেই 'সুপার অসম ক্রাউড' আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। তাঁদের ভালবাসার প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতায় সেদিন আমরা বলেছিলাম, 'এমন শ্রোতা পেলে আমরা গাইতে পারব সারারাত, সব সময়!' পারফরম্যান্স শেষে অনেকেই দেখা করতে এলেন, এলেন অটোগ্রাফ নিতে আর ছবি তুলতে। ওখানে বাংলাদেশের অনেক ছাত্রও ছিল যাদের দেখে মনে হচ্ছিল দেশেই আছি হয়তো বা! সব মিলিয়ে দারুণ ছিল সেই সন্ধ্যা। ৭ নভেম্বরের সেই রাতের কথা আমাদের মনে থাকবে সারা জীবন!

সব কিছুর ভিড়ে মাঝে মাঝেই ভেবেছি, দেশ্ল কালের সীমানা ছাড়িয়ে কিছু অর্জন জীবনভর অনুপ্রেরণা যোগায়; সম্ভাবনার পথ দেখায়; শেখায় পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা, সহনশীলতা আর সম্প্রীতির কথা। সার্ক দেশগুলো নিয়ে আয়োজিত 'সাউথ এশিয়ান ব্যান্ড ফেস্টিভ্যাল' এমনই এক আবহ তৈরি করেছিল সেদিন আমাদের জন্য। এই স্মৃতি সত্যিই অবিস্মরণীয়!

কাজের প্রতি সততা আমাদের আছে কিন্তু চারপাশের মানুষ, তাদের শুভ কামনা আর তীব্র ভালবাসা ছাড়া এই ধরনের প্রাপ্তি কখনোই সম্ভব নয়। আমরা অন্তত তাই বিশ্বাস করি। আর তাই, সেই সব মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানকে আমরা আমাদের এবারের এই বিশেষ সফরকে সফল করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাল্ল ই চাই! এই পুরো প্রক্রিয়ার শুরন্ন যাঁদের হাত ধরে, তাঁদের কথা বলি এবার। প্রথমেই ভারতীয় হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মৃদু পবন দাস, তারপর ঢাকার ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার (আইজিসিসি) এবং এর পরিচালক সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, মিডিয়া ও কালচার সহযোগী কল্যাণ কান্তি দাশ। এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। যে বিশ্বাস রেখে আমাদের এঁরা পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশকে সার্ক দেশগুলোর ব্যান্ড ফেস্টিভ্যালে প্রতিনিধিত্ব করতে, আমরা চেষ্টা করেছি তার সম্মান রাখতে। কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ভারতীয় হাই কমিশনকে আর অবশ্যই বলতে চাই আয়োজক *শেহেল্ল* এর দুর্দান্ত টিমসহ ভারতের সব মিডিয়া আর দিলিস্নর সবাই আমাদের যে ভালবাসা দিয়েছেন, তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত এবং পরম প্রাপ্তি। কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা আর শ্রদ্ধা জানাই বাংলাদেশের ব্যান্ড মিউজিককে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে যারা দেশে এবং দেশের বাইরে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন– আমাদের সেইসব ব্যান্ডকে। বাংলাদেশের সব সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও র সবাইকে যারা আমাদের খবরগুলো সযত্নে সবাইকে পৌঁছে দিয়েছেন। আর বাংলাদেশে আমাদের ভালবাসার মানুষ, আমাদের পরিবার, বন্ধু আর গুণমুগ্ধদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা কি আর বলব! আমাদের প্রতিটি অর্জনকে তাঁরা নিজেদের অর্জন মনে করেন, আমাদের সফলতা, ব্যর্থতায় তাঁরা সব সময় পাশে থাকেন, সাহস যোগান। সত্যি কথা বলতে কি, ভালবাসার যে অতুল ঐশ্বর্য তাঁরা বিলিয়ে যাচ্ছেন, তার মূল্য দিতে আমাদের অনেক খাটতে হবে, অনেক হাঁটতে হবে, অনেক ভাল কাজ করতে হবে– শুধু এইটুকু জানি! চলার পথে পাঁচদিনে দিলিস্ন জয় তো হল, এরপর করতে হবে বিশ্বজয়! সেই দূরের যাত্রায় সবার দোয়া চাই, পাশে চাই সবাইকে, বারবার!

শারমীন সুলতানা সুমী ব্যান্ডশিল্পী, সদস্য চিরকুট

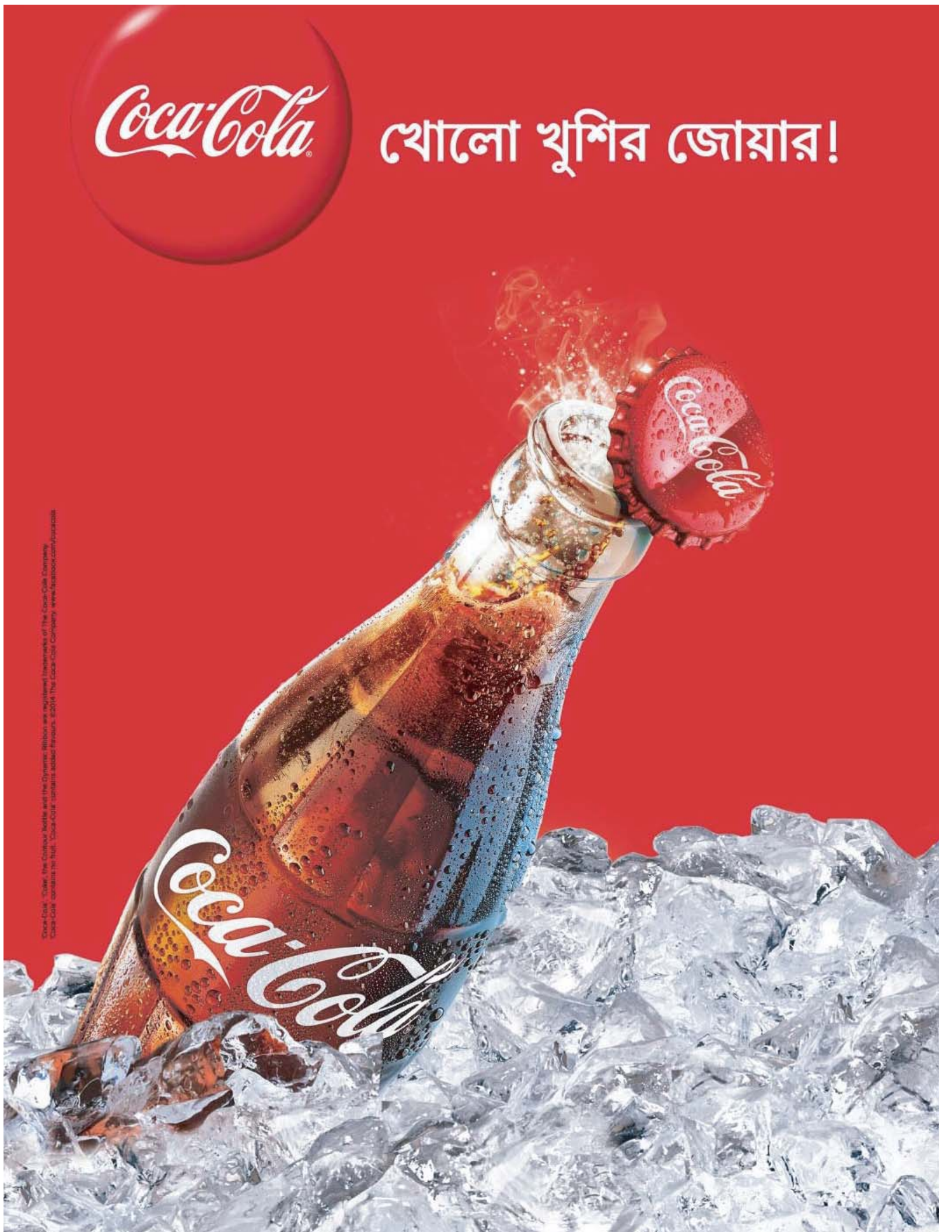
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

চারদিকে এক প্রসন্ন সকাল।

বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায় বাবলা। দিনের প্রথম আলোয় মনোরম হয়ে আছে সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় তার সবটুকু। মুহূর্ত ভাবনায় ও বিচলিত বোধ করে। এসব কি আমার জন্য নাকি হাস্নুহেনার একার? যার বুকের ভেতরে ভালবাসার সরোবরে অজস্র পদ্ম ফুটে আছে?

বাড়ির কারো ঘুম ভাঙেনি।

গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে সবাই নিঃসাড় ঘুমে ডুবে আছে। এমন কি হাস্নুহেনাও টের পায়নি যে ওর পাশে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটি বিছানা ছেড়ে বাইরে গেছে। ঘুম ভেঙেছে ওর একার। অন্য সকালে কখনো ওর এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙে না। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বেলা উঠে যায়। নিজেকেই বলে, আজ কেন ঘুম ভেঙে গেল? জানি না। আমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়া হল না। উল্টো এক বিশাল ক্ষত হৃৎপি-জুড়ে থকথক করছে। ও বাড়ির সামনের মেহগনি গাছের নিচে পায়চারি করে। আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠা দিনের আলোয় স্নাত করে নিজেকে। জীবনের ভিন সময়ে প্রবেশের পরে এই প্রথম নতুন করে সবকিছু দেখার শুরু। ভাবে, ভালভাবে কাটুক সময়। কাটবে তো? এতটাই ভাগ্যবান কি ও? বাবলা ভরসা করতে পারে না। কপাল পোড়ার নিয়ম আছে। এমনইতো জেনে এসেছে ছোটবেলা থেকে। ওর ভাগ্য একশোভাগ ভাল হবে কেন। মন খারাপ করে বাড়িতে ঢোকে ও। দূর থেকেই দেখতে পায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে হাস্নুহেনা। ছোট বারান্দাটিকে বড় পর্বতের মত লাগছে বাবলার। সেখানে হাস্নুহেনা এক রাজকন্যা। ওর খোলা চুল বাতাসে উড়ছে, উড়ছে শাড়ির আঁচল।

মনে হচ্ছে যেন ও উড়াল দিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছে। বাবলা ওর কাছে যেতে পারছে না। ওর পা নড়ছে না। ও বাড়িতে ঢোকার পথে দাঁড়িয়ে থাকে। একটুক্ষণ থমকে থেকে বারান্দা থেকে নেমে আসে হাসুহেনা। অভিমানের স্বরে বলে, কোথায় গেছিলা?

বাবলা মৃদু হেসে বলে, কোথাও না। এখানেই ছিলাম। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম কি সুন্দর সকাল।

গলার স্বর খানিকটুকু উঁচুতে উঠিয়ে হাসুহেনা বলে, আমারে ডাক নাই ক্যান? এখনতো তুমি আর একলা না। তোমার লগে আমি আছি।

তাইতো। ঠিক কইছ। বাবলা বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায়। তারপর কাছে এসে হাত ধরে।

রাগ করেছ?

হাসুহেনা কথা বলে না। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাতে চুলের খোঁপা বাঁধে। আঁচল টেনে মাথায় ঘোমটা দেয়। বাবলা ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে যে কতটা অভিমান করেছে।

চল ঘরে যাই। মা উঠছে।

দু'জনে ঘরের দিকে এগোয়। বারান্দায় দাঁড়িয়েই মা বলে, কি রে তোরা কোথায় গিয়েছিলি?

কোথাও না মা। এই বাড়ির সামনে ছিলাম।

হাসুহেনা দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। শাশুড়ি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, কর কি, কর কি মা?

আপনাকে সালাম করলে আমার সওয়াব হবে। আমি রোজ আপনাকে ভোরবেলা সালাম করব।

রোজ লাগবে না মা। একবার করলেই হবে।

আচ্ছা, ঠিক আছে। যেইদিন আমার মনে দুঃখ থাকবে, সেইদিন করব।

আজ কি তোমার মনে দুঃখ আছে মা?

হাসুহেনা কোন উত্তর না দিয়ে নিজের দু'হাত শাশুড়ির দু'পায়ের পাতার ওপর রাখে। তারপর নিজের কপালে ঠেকায়। বাবলা বুঝে যায় যে ও দুঃখ পেয়েছে। মা ওর দিকে তাকালে বাবলা হাতমুখ ধোওয়ার জন্য কলতলার দিকে যায়। দেখতে পায় বাড়ির সবার ঘুম ভেঙেছে। যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। অল্পসময়ে বাড়িটা কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। এই বাড়িতে একজন নতুন মানুষ যোগ হয়েছে। তাকে বরণ করেছে সবাই। বাবলা হাতমুখ ধুতে ধুতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কেবলই মনে হয় যা চেয়েছি তা পাওয়া হল না।

দুপুরের আগে এসে হাজির হয় চম্পা-পদ্ম আর কয়েকজন খালাতো-মামাতো ভাইবোন। বাড়ি আরও জমে ওঠে। বাবলা দেখতে পায় মা আর বোনেরা ওদের ঘিরে ধরেছে। ওরা মিষ্টি-পিঠেপুলি এনেছে। হাসিখুশি স্রোত বাড়ির প্রাঙ্গণ মুখরিত করে রেখেছে। বাবলার নিজের মধ্যে স্বস্তি নেই। বুক খালি লাগছে। সকালে হাসুহেনা অভিমান করেছে। ওর মান ভাঙানো হয়নি। মায়ের কাছে দুঃখের কথা বলেছে। বাবলার হাতের কাছে গামছা ছিল না। মুখ ধোওয়ার কারণে মুখভর্তি পানির ফোঁটা জমে আছে। ও সবার কাছে এসে দাঁড়ালে চম্পা হেসে বলে, মুখের মধ্যে পানির ফোঁটা। আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে দুলাভাই।

পদ্মও কলকলিয়ে ওঠে। বলে, রাত জেগে বুবু আপনার জন্য পিঠেপুলি বানিয়েছে। পাঁচ রকম পিঠা। এখন এসব খাবেন। তারপর নতুন বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবেন। রাতে থাকবেন। জ্যোৎস্না রাতে বয়াতী চাচা গান গাইবেন।

তুমি দেখছি একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেললে পদ্ম ফুল। রাতে তো আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না।

দুই বোন একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, কেন, কেন যাওয়া হবে না? আমরা আপনাকে নিয়েই যাব।

আমি ঠিক করেছি আমি হাসুকে নিয়ে শাশুড়িবাড়ি যাব।

শাশুড়িবাড়ি যাবি? বাবলার মা বিস্ময়ে তাকায়, কি বলিস তুই?

আমার শাশুড়ি তো বিয়ের সময় থাকতে পারলেন না। মাগো তার মনে দুঃখ আছে। আমি তাকেই সালাম করতে যাব। তিনি যদি আমাদের থাকতে বলেন তাহলে সেই বাড়িতে থাকব।

বাড়ির কারো মুখে কথা নেই। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় বাড়ি।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে হাসুহেনাকে ঘিরে বসে দুই বোন। ঘরে আর কেউ নেই। চম্পা চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মায়ের কাছে যাবে হাসুবু?

হ্যাঁ, যাব। হাসুহেনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

বাজানের কাছে একরাত থেকে তারপরে মায়ের কাছে যাও বুবু। আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

না, তা হবে না। তোর দুলাভাই যা বলেছে তাই হবে।

সারা জীবন দুলাভাই যা বলবে তুমি তাতে সায় দেবে বুবু? সবকিছুতে হ্যাঁ বলবে?

বলতেই পারি। আমি সুখের সংসার চাই।

যদি বলে আমি আর একটা বিয়ে করব।

এক চড় মারব শয়তান। বেশি ফাজিল হয়েছিস।

যদি বলে মেয়ের জন্ম হল কেন? এখনই একটা ছেলে পয়দা কর? কি করবে বুবু?

চুপ করে থাকে হাসুহেনা। বোকার মত ওদের দিকে তাকায়। ওর চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। পদ্ম ওর হাত ধরে বলে, তোমার জীবনে এমন কিছু হবে না বুবু। দুলাভাই বাজানের মত হবে না।

হাসুহেনা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। ঘরে ঢোকে বাবলা। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, কি হচ্ছে তিন বোনের?

পদ্ম হাসতে হাসতে বলে, আমরা গান করছি দুলাভাই।

গান? গান তো শুনলাম না।

গান তো নিজেদের বুকের ভেতরে গাইছি। বাইরের লোকে শুনতে পাবে না।

বাবা, পদ্মফুলতো বেশ কথা বলতে পারে।

পারবইতো। জন্মের পরেইতো কথা শিখে ফেলেছিলাম। আমার জন্যইতো আমার মায়ের এত দুর্ভোগ হল।

শুধু তোর জন্য না। আমরাও আছি। ঠিক বলেছি দুলাভাই?

বাবলা চুপ করে থাকলে পদ্ম বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আপনি কিন্তু হাসুবুকে এমন দুর্ভোগে ফেলবেন না দুলাভাই।

দুর্ভোগ? বাবলা বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায়।

দুর্ভোগইতো। মেয়ের জন্ম হলে তালাক দেওয়া বউকে।

ছি, ছি তোমরা এসব কি বলছ। আমি চিন্তাই করতে পারছি না।

আমরা বুঝেছি আপনি খুব ভালমানুষ দুলাভাই।

শোন, তোমরা আমাকে দুলাভাই বলবে না। বলবে ভাইয়া। বাবলা ভাইয়া। আমি তোমাদের ভাই হতে চাই।

সত্যি? চম্পা আর পদ্ম লাফিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ সত্যি সত্যি। তোমরা খুশিতো?

অনেক খুশি। দুই বোন একসঙ্গে বলে।

হাসু তুমি রেডি হও। আমি শাশুড়িবাড়ি যাব।

রাতে থাকব?

জানি নাতো। শাশুড়ি-আম্মা যদি থাকতে বলেন তাহলে থাকব।

তুমি একটা ব্যাগে কাপড় নিয়ে নাও বুবু। আম্মা তোমাদের থাকতে বলবে।

ঠিক বলেছিস।

চম্পা আর পদ্ম বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। দু'বোনই বিষণ্ন হয়ে থাকে। বুঝতে পারে শিউলি খুব মন খারাপ করবে। বারবার বলেছে, তোরা ওদের নিয়ে আসবি। নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে না থাকলে খুব খারাপ দেখাবে। লোকে বলবে, জামাই শ্বশুরের ওপর রাগ করেছে। মনে থাকবে তো?

থাকবে। দু'বোন ঘাড় নেড়েছিল। এখন ওদের ফিরতে হবে ওদেরকে ছাড়া। ওরা কীভাবে শিউলির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? একই ভাবনা ভেবেছে বাবলা। কীভাবে হাসুহেনাকে নিয়ে শিউলির সামনে দাঁড়াবে? বাবলা মাথা ঝাঁকায়। দরকার নেই শ্বশুরবাড়ির। গোলায় যাক শ্বশুরবাড়ির গাছপালা-পশুপাখি-ধানপাট-মানুষজন। একথা ভাবতেই নিজের মধ্যে বেশ এক ধরনের বাহাদুরি ভাব জন্মায়। ভাবে, এখন কেবলই শিউলিকে আড়াল করার কৌশল শিখতে হবে। তারপর শরীরের ভেতর থেকে মুছে যাবে শিউলির সবটুকু। এমন কি চুমু দেওয়ার জন্য ঠোঁটের কথাও ভাববে না। স্বপ্নে কতবার শিউলির ঠোঁট ওর গায়ে কাঁপন তুলেছিল। এই মুহূর্তে এমন একটি প্রতিজ্ঞায় ও উদ্বুদ্ধ হয়। ঘরের মধ্যে ওরা দু'জন জামা-কাপড় বদলায়। হাসুহেনা বিয়ের শাড়ি পরে। সোনালি ফিতা দিয়ে চুল বাঁধে। জরির কাজ করা স্যান্ডেল পায়ে দেয়। ওকে বেশ দেখাচ্ছে। বাবলা শ্বশুরবাড়ির দেওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। একটি কাপড়ের ব্যাগে দু'একটা জামাকাপড় নিয়ে বের হয় দু'জনে।

চম্পা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, তোমাদের খুব সুন্দর লাগছে বুবু। তোমাদের দেখলে শিউলিবুবুর তাক লেগে যাবে। বলবে, হাসুরে তোর ভাগ্য কত ভাল!

চুপ কর। বুবু কি বলবে তার কথা নিজে বলে যাচ্ছ। পাজি মেয়ে একটা।

চম্পা কাঁদ-কাঁদ হয়ে ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকে। বাবলার মা ছেলেকে ধমক দিয়ে বলে, মেয়েটাকে এমন করে বকলি কেন? কি হয়েছে তোর?

বাবলা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, কিছু হয়নি। বেশি কথা আমার ভাল লাগে না মা।

হাসুহেনার হাত ধরে টান দেয় ও। হাসুহেনা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে বসে শাশুড়িকে সালাম করে। শাশুড়ি বউকে উঠিয়ে নিয়ে বলে, যাও মা। তোমার মায়ের দোয়া নিয়ে আস।

বাবলা বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির দরজায় চলে গেছে। কাপড়ের ব্যাগটা ওর হাতে। হাসুহেনা দুই বোনের বিষণ্ন মুখ দেখে বারান্দা থেকে নামে। বাবলার বোনেরা ওকে ভ্যান গাড়িতে উঠতে সাহায্য করে। বিয়ের দিন যেভাবে সাজানো হয়েছিল সেভাবেই আছে ভ্যানগাড়ি। ওর মন খারাপ। ভ্যান চলতে শুরু করলে ও বাইরে তাকায়। বাবলা সামনের দিকে বসেছে। বাবলার মুখ ও দেখতে পায় না। পিঠ দেখে। পিঠ দেখে মানুষকে বোঝা যায় না। ভাবতে থাকে, শিউলির কথায় বাবলা রেগে উঠল কেন? কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় না। মেঠো রাস্তায় ভ্যানের ঝাঁকুনিতে ও আরও বিষণ্ন হয়ে যায়। জীবনের নতুন শুরুতে এত অন্ধকার কেন? পুরো রাস্তায় বাবলা ওর দিকে একবারও তাকায় না। ওর পিঠ দেখতে দেখতে হাসুহেনা মায়ের বাড়িতে পৌঁছয়।

বাড়িতে শোরগোল পড়ে। চারদিক থেকে ছুটে আসে বাচ্চারা। ঘিরে ধরে ভ্যান। দু'একজন কাগজের ফুল ছিঁড়ে হাতে নিয়ে দৌড়ায়। বাড়ির ভেতর থেকে হন্তান্তর হয়ে বের হয় খলিলুর রহমান। ভ্যানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বাবলার হাত ধরে। মৃদুস্বরে বলে, নতুন বউ নিয়ে শাশুড়ির কাছে এসেছ, একটুতো খবর দিয়ে আসতে হয়। নাকি বাবা?

মায়ের বাড়িতে আসব তার আবার অগ্রিম খবর কি মামা? বলে-কয়ে আসলে কি এই মজা পেতাম?

বাবলার কথা শুনে আনন্দিত হয় হাসুহেনা। ওর ভেতরে চমক জাগে। ভাবে, এমন সুন্দর কথা যে বলে সে মানুষটা নিশ্চয় খুব ভাল। ওর জীবনে হয়তো কোথাও কিছু আটকাবে না। প্রফুল-মনে সামনে তাকালে দেখতে পায় ওর মা এগিয়ে আসছে। খলিল ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, আয় মা।

মামার হাত ধরে ভ্যান থেকে নামে হাসুহেনা, রাশিদুনকে সালাম করে। রাশিদুন বাবলার হাত ধরে বলে, ঘরে চল বাবা। বাবলা শাশুড়ির হাত নিজের মাথার ওপর রেখে বলে, মাগো আপনি আমার আরেক মা। আমাকে ছায়া দিবেন। গাঁয়ে এলেই আমি আপনার কাছে একদিন থেকে যাব।

তোমার কথা শুনে আমার মন জুড়িয়ে গেল। আলাহ তোমাদের ভাল রাখুক।

রাশিদুন দু'জনের হাত ধরে বাড়ির ভেতরে আসে। ততক্ষণে মাজেদা বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে তার ওপর ফুল-পাতার সুঁচিকাজ ভরা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। দুই গাস শরবত বানিয়েছে নুরবানু। আলমারি থেকে কাচের বাটি বের করে নারকেলের নাড়ু সাজানো হয়েছে। মোয়ামুড়িও দেওয়া হয়েছে। একটু পরে ডাবের পানি নিয়ে আসে খলিলুর। সঙ্গে জিলাপি। বাবলা খুশি হয়ে যায়। বলে খবর দিয়ে আসিনি তারপরও এতকিছু। মাগো আপনি–

কিছুতো করতে পারিনি রে বাবা। ঘরে যা ছিল তাই দেওয়া হয়েছে।

সাহানা বলে, মামি আপনি যান। আমরা এখন বুবু-দুলাভাইয়ের সঙ্গে মজা করব।

হ্যাঁ, আমি রান্নাঘরে যাই। রাতের খাবারের জোগাড় করি।

মা, আমি খিচুড়ি আর ডিম খাব। আলু ভর্তাও।

বল কি, বাবা। মুরগি জবাই করব না?

না মা করবেন না। আমি রাতে মুরগির মাংস খাই না। কাল দুপুরে খাব।

দেখ ছেলের কা-। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কথাই থাকবে। তুই কি খাবি হাসু?

খিচুড়ি আর ডিম।

হাসির রোল ওঠে। সালেহা হাসতে হাসতে বলে, রাশিদুন বুয়া আপনার মেয়ে একদিনেই জামাইয়ের বশ হয়ে গেছে। ও বাবা তুমি ওকে কি খাইয়েছ?

ধুতুরার বিষ খালা।

আবার হাসির রোল ওঠে। সালেহা হাসতে হাসতে বলে, ভাল বিষ দিয়েছ বাবা। একদম ঠা-া হয়ে গেছে। ও কি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে?

হাসুহেনা চট করে মাথা তুলে বলে, পারবে। একশোবার পারবে খালা। মাকে কষ্ট দিতে চাইনি বলেইতো আমিও খিচুড়ি-ডিমের কথা বলেছি। ধুতুরার বিষ আমি হজম করতে পারি।

চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা হাততালি দেয়। শিস বাজায়। বলে, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা কানামাছি খেলব। দুলাভাইয়ের চোখ বেঁধে দিয়ে বলব, হাসুবুকে খুঁজে বের করেন। কানামাছি ভোঁ– ভোঁ– পারবেন তো দুলাভাই?

একশোবার পারব।

ছেলেমেয়েরা সুর করে বলতে থাকে একশোবার পারব– একশোবার পারব– একশো–

সুরের আবেশ বেশ লাগে বাবলার কানে। ওদের সামনে পারা শব্দইতো ঠিক উচ্চারণ। ঠিক শব্দটি নিয়ে বেশি ছোটরা উঠোনে ছুটোছুটি করে। ওদের চেয়ে বড়রা বর-বধূকে নিয়ে আয়োজনের মাত্রা সাজায়। ওদের মাথার ওপর পুঁতি-বসানো কাপড় বিছিয়ে ধরে। নতুন শাড়ি, নতুন পরিবেশ– আন্তরিক আপ্যায়ন। নতুন করে বিয়ের অনুষ্ঠান ফুটিয়ে তোলা– ভালই লাগে বাবলার। হাসুহেনার হাতে মৃদু চাপ দেয়।

বারান্দায় বসে থেকে চমকে ওঠে বাবলা। নিজে নিজেই বলে ও কেমন হাসি? এত হাসি না। সামনে জড়ো হয়ে থাকা মেয়েদের কারণে ও রাশিদুনকে দেখতে পায় না। ফলে রাশিদুনের হাসি এ বাড়ির যে কোন জায়গা থেকেই আসতে পারে এমন মনে হয় ওর। হাসুহেনা মায়ের হাসি শুনে মুখ নিচু করে থাকে। ওর চোখ ভিজে যায়। ভাবতে পারে না যে ওর খুশির দিনে মা কেন কাঁদছে।

হাসুহেনা ওর দিকে তাকায় না। মুখ নিচু করে রাখে। মালা হাসুহেনার হাতে শরবতের গস্নাস দিয়ে বলে, বুবু দুলাভাইকে শরবত খাওয়াও।

হাসুহেনা হাত তোলে না। মালা ওর হাত ধরে বাবলার মুখের কাছে নেয়। বাবলা এক চুমুক শরবত মুখ নিয়ে বুঝতে পারে লবণ দেওয়া হয়েছে। ও কোনরকমে গিলে ফেলে গাস্ন সরিয়ে মাথার ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে বলে, যে এই শরবত বানিয়েছে তাকে এখন এই শরবত খেতে হবে। কে সে? সামনে আস।

খিলখিল হাসিতে চারদিক তোলপাড় করে মেয়েরা। বাবলা সোজা হয়ে বসে বলে, সাহস থাকলে সামনে আস।

কেউ একজন বলে, বিয়ে বাড়িতে লবণ-শরবত খেতে হয়। পুরো গস্নাস আপনিই খাবেন। এইটাই নিয়ম।

তবে রে– বাবলা গাস্নটা হাতে নিতে গেলে হাসুহেনা বাধা দিয়ে বলে, থাম।

থামব কেন? আমি এই শরবত দিয়ে ওদের ভিজিয়ে দেব।

পারবেন না। আমরা আপনাকে ভিজিয়ে দেব।

দাও। বাবলা মাথা নিচু করে। কেউ এগোয় না। ও মাথা উঁচু করে বলে, দিচ্ছ না যে?

আপনি না আমাদের দুলাভাই।

ও সব আমার শ্যালিকা! হা হা করে হাসে বাবলা। হাসতে হাসতে বলে, তাহলে আস সবাই মিলে মোয়া-মুড়ি খাই।

একমুঠি খই নিয়ে বাবলা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলে, হাসুবু তোমার বরকে থামাও।

মজা করতেছে, মজা করতে দে না। এটা তার শাশুড়িবাড়ি মামা শ্বশুরবাড়ি।

বাবলা একটা মোয়া হাসুহেনার মুখের কাছে ধরে বলে, খাও।

তুমি আগে। বাবলা এক কামড় খেয়ে হাসুকে দেয়। বলে, খাও। ভাগাভাগির খাওয়া।

মাঝে মাঝে আমি আগে খাব। তারপর তুমি।

একদম ঠিক।

আবার হাসির হুলোড়। হাসির শব্দ শুনে বাবলার মনে হয় ও ঘোরের মধ্যে ঢুকছে। দারুণ লাগছে আজকের এই পরিবেশ। জীবনের ভিন্ন রকম সময়। সময়ের রূপ বদলায়, ক্ষণও বদলায়। তা কতটা স্থায়ী হবে সেটাই চিন্তার বিষয় কিন্তু বাবলা এসব কিছু ভাবতে চায় না। মুহূর্তের আনন্দ ওকে উজ্জীবিত করে। উজ্জীবিত হওয়া তখনই জরুরি যখন আনন্দ বিকশিত করে চারপাশের অন্যজনেরা। বিকশিত আনন্দ নিয়ে ও হাসুহেনাকে ডাকে।

হাসু।

বল।

চল আমরা উঠোনে নেমে যাই। ওদের মত ছুটোছুটি করি। বেশ মজা লাগছে আমার।

পাশে বসে থাকা মেয়েরা বলে, চলেন। চলেন। ছি বুড়ি খেলব আমরা।

পাগল নাকি। বিয়ের শাড়ি পরে দৌড়ানো যায়? না, না আমি যাব না। তুমি যাও।

তোমাকে রেখে আমি যাব না। বিয়ের একদিন পরই ভাগাভাগি ঠিক না। আমরা একসঙ্গে বসে থাকি। এই তোমরা গান কর।

কি গান করব?

যে গান তোমরা জানো সেই গান করবে।

হাসুকে গাইতে হবে?

শুধু হাসু কেন? আমিও গাইব।

আবার হাসির হুলেস্নাড় ওঠে। থেমে যায় একসময়। শুরু হয় গান। –ও পাগলা নাইয়া রে, আমারে তুই কোন দেশে নিবি– ও পাগলা নাইয়ারে আমারে তুই কোন দেশে নিবি– পালের বাতাস লাগে নদীতে তুফান– পাগলা নাইয়ারে তোর নৌকায় মোর মরণ-বাঁচন–।

মেয়েরা গান গাইতে গাইতে তালি বাজায়। সুর ছড়ায় বাড়িতে। রান্নাঘরে বসে কান পেতে গান শোনে রাশিদুন। চোখে পানি আসে। বুক তোলপাড় করে। ওর তৃতীয় মেয়ের বিয়ে হল। পাঁচ মেয়ের মধ্যে প্রথম বিয়ে। জামাই শ্বশুরবাড়িতে রাত কাটায়নি। শাশুড়ির কাছে এসেছে। রাশিদুনের বুক ভার হয়ে যায়। এমন হওয়ার তো কথা ছিল না। তারপরও হয়েছে। যে কারণে হয়েছে সেটা মেনে নেওয়াও কঠিন। বকুল বিদেশ যাওয়ার সময় বলে গেছে, আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন। আমি দালান তুলব। ওই একই কথা, মেয়ের বাড়িতে থাকা। ওর বাড়িটা কোথায়? যেখানে আছে এটাতো ভাইয়ের বাড়ি। তাহলে ও কি একটি কুঁড়েঘর তুলবে বাপের জমির কোন এক সীমান্তে? তখন খলিলুরের বউ বলে, আপনার অনেক ভাগ্য বুজান।

ভাগ্য? আমার আবার ভাগ্য কি? ভাগ্য আছে নাকি?

কি যে কন না। আপনের মত ভাগ্য কয়জনের অয়? আপনে কপাল লইয়া জন্মাইছেন।

মিছা কথা কইও না কইলাম।

আপনের জামাই শ্বশুরবাড়িতে থাহে নাই। আপনের কাছে আসছে। আইজ রাইতে মাইয়ার যদি গর্ভ হয় ওইটাই আপনের কপাল।

রাশিদুন হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ থেকে কথা সরে না। মাথার ভেতরে কিসের যেন ঘূর্ণি। আজ রাইতে মাইয়ার যদি গর্ভ হয়–

খলিলুরের বউ বলে, অমুন কইরা চাইয়া রইছেন ক্যান?

মাইয়ার গর্ভে যদি একটা মাইয়া আসে তার কি হইবে?

আমরা দা-বটি লইয়া খাড়াইয়া থাকুম। জামাই য্যান একটা কথা কইতে না পারে।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে রাশিদুন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসে। খলিলুরের বউ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করতে পারে না, হাসেন ক্যান। জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। অপেক্ষা করে একসময় রাশিদুনের হাসি থামবে। তখন দেখবে যে রাশিদুন কাঁদছে। হাসিটাওতো কান্নারই মত।

হাসির শব্দ ভেসে যায় পুরো বাড়িতে।

বারান্দায় বসে থেকে চমকে ওঠে বাবলা। নিজে নিজেই বলে, ও কেমন হাসি? এত হাসি না। সামনে জড়ো হয়ে থাকা মেয়েদের কারণে ও রাশিদুনকে দেখতে পায় না। ফলে রাশিদুনের হাসি এ বাড়ির যে কোন জায়গা থেকেই আসতে পারে এমন মনে হয় ওর। হাসুহেনা মায়ের হাসি শুনে মুখ নিচু করে থাকে। ওর চোখ ভিজে যায়। ভাবতে পারে না যে ওর খুশির দিনে মা কেন কাঁদছে। মায়ের এমন হাসি ও কখনো শোনেনি। মায়ের আজ কি হল? সামনে বসে মেয়েরা এখনো গানই গাইছে। ওদের কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়েছে। বাবলার গান থেমে গেছে। ও টের পায় যে হাসুহেনা ওর হাত চেপে ধরেছে। মৃদু কাঁপছে ওর হাত।

বাবলা আস্তে করে বলে, চল আম্মার কাছে যাই।

না। ঠিক অইব না। মায়ে তো দুঃখের সাগরে ভাসতাছে। কাছে গেলে দুঃখের ঢেউ উথাল-পাথাল হইবে।

হাসতে থাকে রাশিদুন। আবার সেই একইরকম হাসি। একটু আগে যে হাসি নিয়ে ওদের ভাবনার শেষ ছিল না, দুজনেরই একই সঙ্গে মনে হয় ভাবনার উত্তর পাওয়া গেছে। হাস্নুহেনা বলতে চায়, মাগো আপনি এমন হাসি হাসবেন না। এই হাসিতো বুক-ভাঙা কান্না। বাবলা অবাক হয়ে ভাবে, মানুষের বুকের ভেতরে এমন হাসিও থাকে? একসময় হাসি থামে। রাশিদুন বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, তোমরা ঘুমুতে যাও সোনারা। ঘুমাইয়া ভাল দিনের স্বপ্ন দেখবা।

তা ঠিক। কিন্তু আম্মার হাসির কারণ কি?

দু'জনে আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাইতো হাসির কারণ কি? সেটা আগে জানতে হবে। মন খারাপ হয়ে যায় বাবলার। ওর কেবলই মনে হয় জীবনের এই ভিন্ন সময়ে ও নানা সূত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। প্রতিটি ওর ওপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আনন্দের অনুভূতি।

বিকেল শেষ হয়ে গেছে। সন্ধ্যা শুরুর আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে। ফিকে আলোর ছায়ায় হাস্নুহেনার বুক ভেঙে কান্না আসছে। ওর বিয়ের পরদিন এমন কি হল যে এমন কান্নার মত হাসি হাসতে হবে? হাস্নুহেনা গুনগুন শব্দে কাঁদতে শুরু করে।

রাশিদুনের হাসির শব্দ নেই আর। বারান্দায় উঠে আসে। মেয়েদের বলে সব জিনিস উঠিয়ে নিয়ে যেতে। বাবলার হাত ধরে বলে, ঘরে আস বাবা। কাপড়চোপড় বদলাও। হাতমুখ ধোও। তারপর খিচুড়ি-ডিম দেব। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে যাবে। নতুন একটা কাঁথা সেলাই করেছি। নতুন কাঁথা দিয়ে তোমাদের বিছানা আমি করে দেব। সুতার ফুলতোলা বালিশের কভারও আছে।

রাশিদুনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বাবলা।

থাক থাক বাবা ওঠো।

আম্মা আপনাকে আমি সব সময় সালাম করব। আপনার পায়ে হাত রেখে আমার সমস্যা কাটাতে চাই।

ভাল থাক বাবা। ভাল থাক।

রাশিদুন দ্রুত কণ্ঠে কথা বলতে বলতে ওদের ঘরে নিয়ে যায়। ঘরে কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। আলো-আঁধারিতে মাকে একজন মায়াবী নারী মনে হয় হাস্নুহেনার। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মাগো আমার বিয়েতে আপনি খুশি হয়েছেন?

খুব খুশি হয়েছি মারে। আমার খুশির শ্যাষ নাই। আমার খুশি তোর মাথার মুকুট হোক সোনা।

হাস্নুহেনা মাকে জড়িয়ে ধরেই রাখে। মাকে ও ছাড়তে চায় না।

রাত বাড়ে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়। ঠিকমত খেতে পারে না বাবলা। কেবলই মনে হয় সম্পর্কের সূত্রে ঘোরপ্যাঁচ আছে। সম্পর্ক সহজ না হলে শাশুড়ির কাছেও আশ্রয় মেলে না। আশ্রয় একটি কঠিন জায়গা।

খাচ্ছ না কেন বাবা? ভাল লাগছে না।

এমন মজার খিচুড়ি অনেকদিন খাইনি। শহরে থাকিতো, তাই মায়ের হাতের রান্না খাওয়া হয় না।

মাসে একবার বাড়িতে এস।

এততো ছুটি পাওয়া যাবে না।

তাইতো।

তাহলে হাস্নু–

কথা শেষ করতে না দিয়ে হাস্নুহেনা মাকে বলে, আমিও চাকরি করব মা। শুধু রান্না করার জন্য ঘরে বইস্যা থাকুম না। কি কও?

বাবলার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে ও।

তাহলে তো খিচুড়ি খাওয়ার জন্য তোমাকে বাড়িতে আসতে হবে বাবা।

আমি বছরে একবার খিচুড়ি খাব। সেটা আরও মজার হবে।

আচ্ছা, তোমরা ঘুমাও।

রাশিদুন বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে দু'জন কাপড় বদলায়। হাস্নুহেনা বলে, এখন আমার ঘুম আসবে না। আমি মায়ের কাছে বসতে চাই কিছুক্ষণ।

আমিও চাই। আমারও মন কেমন করছে।

দু'জনে দরজা খুললে দেখতে পায় রাশিদুন একা বারান্দায় বসে আছে। উঠোনে জ্যোৎস্নার মনোরম স্নিগ্ধতা। বাড়ি সুনসান। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও পাখির ডাকও নেই। হাস্নুহেনা কাছে গিয়ে বলে, আম্মা আপনের কাছে বসি?

বস মা। তোর কি ঘুম আসছে না।

বাবলা গা-ঘেঁষে বসে বলে, আমরা আপনার কাছে একটু বসি। তারপরে ঘুমাব।

রাশিদুন বাবলার মাথা বুকে টেনে নিয়ে বলে, দোয়া করি তোমরা খুব ভাল থাক। কবে ঢাকায় যাবা?

কালকে। রাতের বাসে উঠব। তাহলে দিনটা আমার মায়ের কাছে থাকতে পারব।

আহা রে সোনার ছেলে। মায়ের বুকে দুঃখু দিও না।

হাস্নুহেনা মায়ের কাঁধে মাথা রেখে বলে, কালকে আপনে কোন কাজে যাইবেন আম্মা?

যামুতো। জমিলার কাছে যামু। দুই বছর হইছে ছেড়ির।

ও কেমুন আছে?

আর কেমুন থাকব। আছে জানে বাঁইচা। কাইলকে অর ডাক্তার দেহানোর দিন।

ওর কি হইছে আম্মা?

রাশিদুন তিক্ত স্বরে বলে, মাইয়া হইল কেন? হের লাইগা হের বাপে মাইয়ার মুখে এসিড ঢাইলা দিছিল। বাপেই এসিড দিয়া পুড়াইছে ওরে।

ওহ আলাহরে–। বাবলা আর্তনাদ করে।

শব্দ করে হেসে ওঠে রাশিদুন। হাসতে হাসতে বলে আমার কপাল ভাল যে আমার মেয়েদের মুখে এসিড দেয়নি ওর বাপে। আমার মেয়েরা ভাল আছে।

হাসতে থাকে রাশিদুন। আবার সেই একইরকম হাসি। একটু আগে যে হাসি নিয়ে ওদের ভাবনার শেষ ছিল না, দুজনেরই একই সঙ্গে মনে হয় ভাবনার উত্তর পাওয়া গেছে। হাস্নুহেনা বলতে চায়, মাগো আপনি এমন হাসি হাসবেন না। এই হাসিতো বুক-ভাঙা কান্না। বাবলা অবাক হয়ে ভাবে, মানুষের বুকের ভেতরে এমন হাসিও থাকে?

একসময় হাসি থামে। রাশিদুন বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, তোমরা ঘুমুতে যাও সোনারা। ঘুমাইয়া ভাল দিনের স্বপ্ন দেখবা।

বাবলা আর হাস্নুহেনা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

আজকের রাত আমাদের জীবনে শুভ রাত হোক।

বাবলা হাস্নুহেনাকে বুকে টেনে নেয়। বলে, আজ রাতে আমরা উৎসব করব।

হাস্নুহেনা চোখের পানিতে নিজেকে ভিজিয়ে বলে, আমার মা এই উৎসবের অপেক্ষায় থাকবে। আজ রাতে মায়ের ঘুম আসবে না।

বাবলা মৃদুস্বরে বলে, আমি তা বুঝতে পেরেছি। যাওয়ার আগে মাকে বলে যাব, মাগো ভয়ের কিছু নাই।

হাস্নুহেনা প্রবল বাসনায় ওকে জড়িয়ে ধরলে বাবলার মনে হয় জীবনের সবটুকু দুঃখের না। অনেক আনন্দ আছে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

শিল্পোদ্যোগ

টাটা শিল্প-সাম্রাজ্য
অতীত ও বর্তমান

ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে, টাটা গ্রুপের বয়স তখন ৭৯ এবং সুসংহত হবার প্রথম পর্যায়ে। ১৮৬৮ সালে জামশেদজী টাটার হাতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর ৩৩ বছর পর তিনি পরলোকগমন করেন। সেই থেকে টাটা গ্রুপ ব্যবসায়ের পরিধি শুধু বাড়িয়েই চলেছে– বীমা, ভোজ্যতেল, সাবান, সোডা থেকে ইস্পাত, তারপর ১৯৩২ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন পর্যন্ত। ততদিনে এর চেয়ারম্যান জামশেদজী টাটার পুত্র দোরাবজী বিগত হয়েছেন।

গ্রুপের তৃতীয় চেয়ারম্যান দোরাবজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী নওরোজি সাকলাতওয়ালা একে সুসংহত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৮ সালে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুর পর জেআরডি হিসেবে সমধিক খ্যাত জাহাঙ্গীর রতনজী দাদাভাই টাটা যখন নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন, তাঁর বয়স মাত্র ৩৪। অর্ধশতাব্দীকাল জেআরডি-র নেতৃত্বে টাটা গ্রুপের বেসামরিক বিমান চলাচল শুরু হয়। ১৯২৯ সালে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি বাণিজ্যিক বিমান চালকের লাইসেন্স লাভ করেন। এর ৩ বছর পর তিনি টাটা এভিয়েশন সার্ভিস বা টাটা এয়ারলাইনস্ প্রতিষ্ঠা করেন– পরবর্তীকালে যার নাম হয় এয়ারইন্ডিয়া। এয়ারইন্ডিয়া পরে সরকারি সংস্থায় রূপান্তরিত হয়।

ভারতের বিমান চলাচল ইতিহাসের প্রথম বিমানটি অধুনা পাকিস্তানের করাচির ড্রিগ রোড থেকে যাত্রা শুরু করে যার Puss Moth-এর নিয়ন্ত্রণ ছিল জেআরডি-র হাতে।

জেআরডি-র প্রথম জামানায় আরো ৩টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প টাটা গ্রুপের শিল্প-সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি টাটা কেমিক্যাল লি. প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই এখন দেশের সর্ববৃহৎ সোডা অ্যাশ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। লোকোমোটিভ ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদনের জন্য তিনি ১৯৪৫ সালে টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড লোকোমোটিভ কোম্পানি লি. প্রতিষ্ঠা করেন।

জামশেদজী টাটা

এর বর্তমান নাম টাটা মোটরস লি. এবং রাজস্বর মাপকাঠিতে এটিই ভারতের সর্ববৃহৎ অটো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে একই বছরে তিনি টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ লি. নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ তথ্য প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক সেবা, অটো কম্পোনেন্ট, এডভান্সড্ ম্যাটেরিয়ালস, টেলিকম হার্ডওয়্যার ও সার্ভিসসহ যৌথ উদ্যোগ শুরু করে।

বাঁক বদল

স্বাধীনতা পর টাটা গ্রুপের গল্প নানাদিকে মোড় নেয়। নানামুখী বাঁক নেয়। এই বাঁক বদলের মধ্যে ছিল বহুমুখীকরণ, প্রবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা, উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা অর্জন, আন্তর্জাতিকীকরণ এবং উদ্ভাবন।

এই দীর্ঘ পথপরি ক্রমায় টাটা গ্রুপকে সামাজিক অচলায়তন ও রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, নানা ব্যর্থতা ও হতাশার মোকাবেলা করতে হয়েছে। জেআরডি চা উৎপাদন (টাটা গোবাল বেভারেজেস লি.), রপ্তানি (টাটা ইন্টারন্যাশনাল লি.) এবং প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের নকশা ও উৎপাদনের জন্য সিঙ্গাপুরে টাটা প্রিসিশন ইন্ডাষ্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) প্রতিষ্ঠা করেন।

রতন টাটার নেতৃত্বে গ্রুপের পরবর্তী সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯৯১ সালে চেয়ারম্যানের পদ থেকে জেআরডির স রে দাঁড়ানোর পর তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র রতন টাটার মনোনয়ন ছিল চমকপ্রদ।

রতন টাটার প্রথম কয়েক বছর কাটে জেআরডির বি কেন্দ্রীভূত কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে। গ্রুপের কোম্পানিগুলোকে আরও দক্ষ করে তুলতে তাঁর প্রচেষ্টা শুরু হয়। তিনি টাটার আন্তর্জাতিক বিস্তারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন।

২০০০ সালে টাটা গ্রুপ ৪৫ কোটি ডলার দিয়ে ব্রিটিশ চা ব্র্যান্ড টেটলি কিনে নেয়। এটি ছিল কোন ভারতীয় কোম্পানির সর্ববৃহৎ বৈদেশিক অর্জন। এই ক্রয়ের পর টাটা গ্রুপের ক্ষুধা আরো বেড়ে যায়। সাত বছর পর ১ হাজার ১৯০ কোটি ডলার দিয়ে এ্যাংলোডাচ ই স্পাত প্রস্তুতকারী সংস্থা কোরাস গ্রুপ পিএলসি কিনে নেয়; একই বছর ২৩০ কোটি ডলার দিয়ে ফোর্ড মোটর কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটেনের দু'টি বিখ্যাত অটো ব্র্যান্ড জাগুয়ার ও ল্যান্ড রোভার কিনে নেয়।

এরই মধ্যে ২০১২ সালের ২৮ ডিসেম্বর ৭৫তম জন্মদিনে রতন টাটা অবসর গ্রহণ করেন। ২১ বছর তিনি টাটা গ্রুপের শিরোভূষণ হয়ে ছিলেন। রতন টাটার সময়কালে গ্রুপের রাজস্ব ১৯৯১এর ১৪ হাজার কোটি থেকে ২০১১১২ অর্থবছরে ৪.৭৬ ট্রিলিয়নে গিয়ে পৌঁছয়।

টাটা নামধারীদের বাইরে দ্বিতীয় চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রি যখন শিরস্ত্রাণ হাতে নিলেন, আরেক ধরনের সুসংহতির সময় এসে গেল। ভারতীয় অর্থনীতি তখন অবনতিশীল– যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে চলছে অর্থনৈতিক সংকট।

সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে অনধিক দুই বছরে সাইরাস মিস্ত্রি টাটা গ্রুপ সম্প্রসারণের চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। সম্ভাব্য বিনিয়োগহীনতা ও পুনর্বিন্যাসের মধ্যেও টাটা গ্রুপ আগামী ৩ বছরে ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রসাণের জন্য গ্রুপটি এখন ক্রয়যোগ্য প্রতিষ্ঠান খুঁজছে। এটি এখন প্রতিরক্ষা ও বিমান, খুচরা ব্যবসায়, অবকাঠামো ও অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে জোর দিচ্ছে।

আজ টাটা গ্রুপের ৭টি ব্যবসায় খাতে শতাধিক কোম্পানি কাজ করছে। এ সাতটি খাত হচ্ছে– যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাটেরিয়ালস্, বিভিন্ন ধরনের সেবা, বিদ্যুৎ, ভোক্তা পণ্য ও কেমিক্যাল। টাটা কোম্পানি ৬টি মহাদেশের শতাধিক দেশে সক্রিয় আছে এবং আরো দেড় শতাধিক দেশে পণ্য রপ্তানি ও সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী এ কোম্পানির কর্মিসংখ্যা ৫ লাখ ৮১ হাজার ৪৭০ জন এবং ৩১ মার্চে সমাপ্ত অর্থবছরে ১০ হাজার ৩২৭ কোটি ডলার রাজস্ব আয় করেছে যার ৬৭.২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে ভারতের বাইরে থেকে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

টাটা গ্রুপের ৯ তথ্যচুম্বক

- ১৮৭৭ সালে টাটাদের প্রথম প্রকল্প শুরু হয় এমপ্রেস মিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

গ্রুপের প্রাচীনতম প্রায়োগিক ব্যবসায় হচ্ছে তাজ মহল প্যালেস ও টাওয়ার– মুম্বইয়ের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেল।

১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু গ্রুপকে ভারতে প্রসাধনসামগ্রী উৎপাদনের অনুরোধ জানান– যার ফলশ্রুতি ল্যাকমে, পরে এটি হিন্দুস্থান ইউনিলিভারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

- টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস লিমিটেড হচ্ছে ভারতের প্রথম কোম্পানি যার মার্কেট ক্যাপিটাল ৫ ট্রিলিয়ন রম্নপি ছাড়িয়ে গেছে।

২০০৮ সালে টাটা মোটরস্ পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা গাড়ি টাটা ন্যানো উদ্বোধনী বিক্রয় মূল্য মাত্র ১ লাখ রুপিতে বাজারে ছাড়ে, যা কোম্পানিকে বিব্রত করে এবং রতন টাটা ২০১৩ সালে বলেন যে টাটা ন্যানোকে পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা গাড়ি হিসেবে বিক্রি করাটা ছিল ভুল।

- ২০১২ সালে টাটা গোবাল বেভারেজেস ও স্টারবাকস্ যৌথ উদ্যোগে টাটা স্টারবাকস্ লি. প্রতিষ্ঠা করে, যার প্রথম দোকানটি খোলা হয়েছে মুম্বইয়ে।

- ১৮৬৮ সালে শুরু হওয়ার পর কোম্পানির চেয়ারম্যান এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন।

গ্রুপের বর্তমান চেয়ারম্যান পালোনজী মিস্ত্রির পুত্র সাইরাস মিস্ত্রি টাটা সনস্ লিমিটেডের ১৮.৪ শতাংশ স্টেক হোল্ডার– তিনিই কোম্পানির একক বৃহত্তম শেয়ার হোল্ডার।

ভারতীয় এয়ারলাইনস্ শিল্পে ঢোকার জন্যে টাটা গ্রুপ দু'দুবার সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস্ লিমিটেডের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গত বছর টাটাএসআইএ এয়ারলাইনস্ লিমিটেড নামে যৌথ উদ্যোগ তাদের তৃতীয় চেষ্টা এখন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের লাইসেনস্ প্রাপ্তির অপেক্ষায়।

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪১৫ অর্থ বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপা রেশনআইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের পস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩৬ মা সের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫৪৫ বছ রের মধ্যে হবে এবং সরকারি বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:
fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.
Any queries may be addressed to
fscom@hcidhaka.gov.in

ছোটগল্প

রক্তমাংস এবং নারীমূর্তি

রফিকুর রশীদ

কার্তিকের কুয়াশা এবার যেন আশ্বিনের গোড়াতেই ঘিরে ধরেছে চারিদিক। সন্ধ্যা ঘনিয়ে নামতে না নামতেই মিহি বরফকুচির মত কুয়াশা পড়তে শুররু করে। সেই কুয়াশায় ভিজে ভিজে গ্রামের বউ-ঝিয়েরা আসে পূজামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে। প্রতিমা দর্শনকে তারা বলে ঠাকুর দেখা। তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। সারাদিনের ঘর-গেরস্থালি সামলানোর পর স্নান-টান সেরে বেশ একটা স্নিগ্ধ পবিত্রতা অন্তরে ধারণ করে তারা আসে মণ্ডপে। বাইরের রেলিং ধরে দাঁড়ায়। কী যে দেখতে চায়, আর বাস্তবে কী দেখতে পায় তার নেই ঠিক-ঠিকানা। বাঁশ-খড়-কাদামাটিতে প্রতিমার মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে যাবার পর পূজাকমিটির লোকজন পর্দা টেনে দিয়ে যায়। মাথার উপরে এনার্জি সেভিং বাল্ব আলো ছড়ায় ফকফকা, পর্দার ভেতরে রবি পাল তার সঙ্গীসাগরেদ নিয়ে কাজ চালিয়ে যায়; পর্দার আড়াল থেকে যেটুকু আলো বাইরে বেরিয়ে আসে তাতে গা-ছমছমে অন্ধকার আরও ভূতুড়ে পরিবেশ রচনা করে কুয়াশার সঙ্গে মিশে। তবু তাদের আসা চাই। কুয়াশার চাদরের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দেওয়া চাই। একটুখানি ফাঁকফোকর গলে যদি-বা সামান্যতম দেবীদর্শনও ঘটে যায়, তাতেই জীবন ধন্য। রবি পাল সহসা একদিন এদের মধ্যেই আবিষ্কার করে বসে তার হারানো কন্যা সাবিত্রীকে। ঠিক সেই নাক-মুখের গড়ন, থুঁতনির নিচে কাটা দাগ, চোখ দুটো টানাটানা– চমকে ওঠে রবি পাল। হৃৎপি- লাফিয়ে ওঠে। রেলিঙের দিকে দু'পা এগিয়ে যায় আর ভাবে, এ হতভাগী এখানে এল কেমন করে!

সেবার সেই অঘটনের পর বছর দুই-তিন প্রতিমা গড়ার কাজে মনোযোগই দিতে পারেনি রবি পাল। বর্ষা গিয়ে শরতের কাশফুল পাখনা মেলতে না মেলতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের বায়না আসে। না বললে তো চলে না। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে বেশ কয়েক গ্রামের পূজামণ্ডপে তাদের বাঁধা কাজ; ফেরাবে কী করে? কৃষ্ণনগরের মালাকারদের যে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি, তাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়েছে সত্য পাল। একমাত্র পুত্র নিত্য পালকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে। নিত্য একবার বর্ডার টপকে ইন্ডিয়ায় গিয়ে দেখে আসে বিভিন্নরকম ঠাকুর। রবি তখন সবে কৈশোরে।

এ্যাঁ, ওইটুকুন মেয়ের মাথায় সিঁদুর! না না, সাবিত্রী সিঁদুর কোথায় পাবে!

বিয়ের কোন কথাই নেই, কেশবপুর হাই ইশকুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী; সেখান থেকে কলেজে যাবে, আইএ-বিএ পাস করবে, তারপর মাথায় সিঁদুর। মাস্টারি করার শখ ছিল তার। কোথায় উড়ে গেল সে সব শখ স্বপ্ন! গেলবার ভোটের মৌসুমে দুটো বদরাগী মোটর সাইকেল গাঁ গাঁ করে ছুটে এসে হেডলাইটের তীব্র আলোয় প্রথমে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তারপর বাজপাখির মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় তাকে। কোথায় যায় কতদূরে, অনেক তত্ত্বতালাশ করেও সে কথা জানা যায়নি, অথচ এতদিন পরে এই এতদূরে প্রতিমা গড়তে এসে সেই সাবিত্রীকে এভাবে হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে– এ কি ভাবা যায়!

রবি পালকে এগিয়ে আসতে দেখে অল্পবয়সী বউটি মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। রবি পাল তখন উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সাবিত্রীর চেয়ে এই মেয়েটির গায়ের রঙ বেশখানিক চাপা। গ্রামের মানুষ কালোই বলবে। না, না, এ মেয়ে তার সাবিত্রী নয়। এ ব্যাপারে নিঃসংশয় হবার পর সৃষ্টি হয়েছে আরেক জ্বালা। সাবিত্রীর অন্তর্ধান সেই কবেকার কথা! সহসা তার মুখ মনেই পড়ে না। অথচ এই ঘোমটা টানা বউটি কেমন করে যেন রবি পালের অন্তরের খুব নিভৃত এক কোণে নিজের জন্যে আসন পেতে নেয়। দেবীমূর্তির আদল ফোটাতে গিয়ে ভারি সংকট দেখা দেয়, কালোপনা সেই বউটি এসে তার কাঁধে ভর করে, কিছুতেই নামতে চায় না। রবি পাল তখন কী করে! হাতের কাজ ফেলে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিজের হাতে গড়া খড়-মাটির মূর্তির দিকে। চোখের পলক পড়ে না। তাকিয়েই থাকে নির্নিমেষ। দেবীর তখনো চক্ষুদান সম্পন্ন হয়নি। ফলে চোখে চোখে কোন কথা হয় না। তবু অন্তরে অন্তরে আকুল হয়ে শুধায়,

সত্যিই তুই কৈলাস থেকে নেমে এয়েচিস মা?

দেবী নিরুত্তর। ভেতরে ভেতরে দগ্ধায় রবি পাল। আবার প্রশ্ন করে,

কীসে চড়ে এলি এবার? গজে না রথে?

উত্তর আসে না কিছুই। কিন্তু রবি পালের কানের দরজায় আছড়ে পড়ে সেই কবেকার কালসন্ধ্যায় শোনা দুর্বৃত্ত মোটরবাইকের গোঁয়ার গর্জন। তখনই কানে আঙুল গুঁজে বিভ্রমটা সে শুধরে নেয়– না, সে তো আগমনী ছিল না, ছিল প্রতিমা বিসর্জনের পালা। নৌকায় নয়, দেবী চলে যায় মোটরবাইকে চেপে; ওরা দু'জনের মাঝখানে চেপে বসায়, মুখে রুমাল গুঁজে দেয়; তারপর ভটভটানো শব্দ তুলে হাওয়া। রবি পাল অস্ফুটে বিড়বিড় করে– সেই তোর যাওয়া, আর এই আদ্দিন পরে এলি মা?

সেবার সেই অঘটনের পর বছর দুই-তিন প্রতিমা গড়ার কাজে মনোযোগই দিতে পারেনি রবি পাল। বর্ষা গিয়ে শরতের কাশফুল পাখনা মেলতে না মেলতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের বায়না আসে। না বললে তো চলে না। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে বেশ কয়েক গ্রামের পূজামণ্ডপে তাদের বাঁধা কাজ; ফেরাবে কী করে? কৃষ্ণনগরের মালাকারদের যে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি, তাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়েছে সত্য পাল। একমাত্র পুত্র নিত্য পালকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে। নিত্য একবার বর্ডার টপকে ইন্ডিয়ায় গিয়ে দেখে আসে বিভিন্নরকম ঠাকুর। রবি তখন সবে কৈশোরে। নিত্য পাল পরম আগ্রহে কিশোরপুত্রকে শোনায় তার অভিজ্ঞতার বিবরণ, কাদা মাটি তৈরি থেকে খড় বাঁশ বাঁধা ছাঁদা সবই শেখে রবি পাল পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। অল্পবয়সেই তার হাতযশ ছড়িয়ে পড়ে। ভারি নামডাক। নিত্য পাল গর্ব করে বলে– আমার খোকার হাতে প্রাণ পায় প্রতিমা, মূর্ত হয়ে ওঠে।

বাবার এসব ভারি কথা কানে যায় ঠিকই, সবটুকু বুঝতে পারে না রবি। বাবার কাছে জানতে চায়, মূর্ত হওয়া মানে কী বাবা?

নিত্য পাল এক গাল হাসি ছড়িয়ে বলে,

মূর্ত মানে প্রকাশ। এই যেমন তোমার মাঝে মূর্ত আমি, আমার আর মরতে দ্বিধা নাই।

নিত্য পালের স্বভাবটাই ওইরকম। পেটে খানিক বিদ্যে থাকায় যখন তখন ভারি ভারি কথা উগরে ওঠে। নিজের দোষে লেখাপড়া হয়নি রবি পালের। এ জন্যে সে ভয়ানক দীনতা বোধ করে। শেষ পর্যন্ত নিজের মেয়ে সাবিত্রীকে ইশকুলে পাঠিয়ে সে দীনতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছে রবি কিন্তু সেই সাধই-বা পূর্ণ হল কই! মা-উমা চলে গেল কৈলাসধামে। তখন কী করে রবি পাল?

এদিকে রবি পালের শিষ্য অনন্তর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। দীর্ঘক্ষণ গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবান্তর ধরতে পারে না। বেশ ক'দিন থেকেই দেখছে এই আনমনা ভাব। এখন হল কাজের সময়, এখান থেকে যেতে হবে আরেক জায়গায়, সেখানেও তাড়া আছে, এ সময় আনমনা হলে চলে! মিহি করে মাখানো কাদার লেই হাত থেকে নামিয়ে রেখে কাছে এগিয়ে এসে সে জিগ্যেস করে– আজও কি কাজ...

খপ করে মুখের কথা কেড়ে নেয় রবি পাল, এতক্ষণ পর যেন দম নেবার ফুরসত পায়, হ্যাঁ হ্যাঁ আজও বন্ধ থাক।

সময় কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছে। অনন্ত খুঁচিয়ে দেয়– কত তারিখ গেল মনে আছে তো!

বেদি থেকে নেমে এসে রবি পাল বলে,

আরে যা যা! রবি পাল হাত লাগালে ক'দিন?

তা বটে, মন খোলসা থাকলে সে দু'হাতে একাই পারে দশ হাতের কাজ গুটাতে। সে কথা সবাই জানে। তার প্রবল বিশ্বাস, এ হচ্ছে দশভুজা দুর্গারই আশীর্বাদ। কাজে মন বসালে মা দুর্গা তখন করিয়ে নেয়। এই জায়গায় এসে রবি পাল অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করে। গভীরভাবে বিশ্বাস করে– এ সময়ে নির্ঘাৎ তার গর্ভধারিণী মা স্বর্গ থেকে নেমে আসে, খুব নিভৃতে তার বুকের কবাট হাট করে খুলে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেয় এবং তাকে শত সহস্রবার প্ররোচিত করে– খোকা তুই হাত চালা দেখি, আমি তো আছি!

রবি পাল দ্রুত হাত চালায়। খড় বাঁশ পাট সুতালি বাঁধে। কাদা মাটি লাগিয়ে ভরাট করে। রাত জেগে জেগে নিপুণ হাতে চিকন মসৃণ কাজ করে। রঙ তুলিতে মন-প্রাণ ঢেলে দেয়। খুব ছোট বেলা থেকেই তো সে দেখেছে তার মা জননী একা হাতে কেমন করে ঘর-সংসার গুছিয়ে আলো করে রাখে! দশভুজা না হলে তাই কিছুতে সম্ভব! প্রতিমার গায়ে পোশাক-পরিচ্ছদ গয়নাগাঁটি পরানো সারা হলে দিব্যি সেই দশভুজা জগজ্জননী। চোখের কোণে সন্তানের জন্যে অবাধ প্রশ্রয়। তখন রবি পাল নির্মোহ এবং নির্লিপ্ত শিল্পীর মত আর নির্বাক বসে থাকতে পারে না। প্রতিমার চোখে চোখ রেখে স্ফুটকণ্ঠে ডেকে ওঠে– মা! দয়াময়ী মা

রবি পাল পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে দেবী প্রতিমার কাছে। ষষ্ঠী এসে গেছে, বোধনের আর বিশেষ বিলম্ব নেই। পর্দা উঠে যাবে দেবী উন্মোচিত হবেন, সর্বসমক্ষে। তার আগে আপন সৃষ্টির সামনে এসে কুণ্ঠাহীন দৃঢ়তায় দাঁড়ায় রবি পাল। দেবী প্রতিমার মাথার চেলি থেকে পায়ের আলতা পর্যন্ত ঘোর-লাগা চোখে পর্যবেক্ষণ করে। পর্দা উন্মোচনের আগে শেষবারের মত চাখ বুলিয়ে নেওয়া– কোথাও কোন সংশোধনী যদি লাগে। কোথাও! কোথাও! রবি পালের দৃষ্টি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিমার সুউন্নত বক্ষদেশের উপত্যকায়।

আমার! রাতের বৃন্ত থেকে ফুটে ওঠে ভোরের কুসুম। পাখিদের কলকাকলিতে জেগে ওঠে পৃথিবী। রবি পাল আকুল হয়ে ডুকরে ওঠে– মা ধরণী, এই যে এখানে আমি তোর অধম সন্তান। অকৃতি অধম।

স্থানীয় খবরের কাগজের শারদীয় সংখ্যায় একবার রবি পালের শিল্প-সংসার নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে লেখা হয় রবি পালের হাতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে প্রতিমা। এই বাঙ্ময় শব্দটি নিয়ে সে পড়ে মহা আতান্তরে। কী অর্থ এই শব্দের? কাকে শুধাবে? তার খুব মনে হয়, বাবা বেঁচে থাকলে নিশ্চয় এক গাল হাসি ছড়িয়ে অনায়াসে বুঝিয়ে দিত এই শব্দের মানে। প্রতিবেদক লিখেছে বেশ– রবি পালের ঐকান্তিক ইচ্ছে একটি মাতৃমূর্তি গড়ার। দুর্গা প্রতিমা গড়তে গিয়ে তিনি নিমগ্ন চোখে মাকে দেখেন। তাঁর ইচ্ছে গর্ভধারিণী মায়ের মূর্তিটি এমনভাবে গড়বেন যেন সেদিকে তাকালেই দুর্গাপ্রতিমাকে দেখা যায়, যেন এই বাংলাদেশকে অনুভব করা যায়। রবি পাল অবাক হয়– এ সব কথাও লিখতে হয় কাগজে!

না, সেই মেয়েটিকে আর কোনদিনই দেখতে পায়নি রবি পাল। প্রথম দেখায় সাবিত্রীর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যের দিকগুলো যেমন এক ঝটকায় এসে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারপর দিনে দিনে ঘোর কেটে যায়; দর্শনার্থীদের ভিড়ে তাকে খুঁজে না পেয়ে সে দুই চেহারার মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলো আবিষ্কারে তৎপর হয় সেই তেমন করেই। কিন্তু কোথায় সাবিত্রী! বৈসাদৃশ্যই বড় হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। তবু সেই ঘোমটা টানা অল্পবয়সী বউটিকে অন্তত পক্ষে আর একবার দেখার খুবই ইচ্ছে জাগে। নাকে নথ, মাথায় ঘোমটা, পরনে ডোরা শাড়ি সেই মেয়েটির কোন পরিচয় তো তার জানা নেই, কাকে কী শুধাবে? হাতের কাজ ফেলে অনন্তর দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে সে প্রতিদিনই একাধিক বার এসে খোঁজ নিয়ে যায়– সে কি এল?

না, সে আর আসে না।

সে যে সাবিত্রী নয় এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর রবি পাল তাহলে কাকে খোঁজে? কেন খোঁজে? কাজের অবকাশে এ প্রশ্ন সে নিজের কাছেই উত্থাপন করেছে। সত্যিই তো, সে কাকে খোঁজে? বুকের মধ্যে কিসের এত হাহাকার গুমরে ওঠে? কিসের এত শূন্যতা? প্রতিদিন পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতূহলী মানুষগুলোর ভক্তিনম্র দৃষ্টির আয়নায় এতদিন পরে কী খোঁজে সে? কাকে খোঁজে? এমন তো ছিল না আগে! তবে কি ঘোমটা পরা অল্পবয়সী গ্রাম্যবধূটি অলক্ষ্যে কোথাও সর্বনাশের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে! আর দৃশ্যমানতার আড়াল থেকে সে বুঝি মজা দেখছে!

আবার একদিন দর্শনার্থীদের ভিড়ে এক মাতৃমূর্তিতে দৃষ্টি আটকে যায় রবি পালের। হ্যাঁ, মাতৃমূর্তিই তো! অল্পবয়সী এক যুবতিমাতা কেমন অবলীলায় তার জামার বোতাম খুলে দুগ্ধভারানত স্তনবৃন্ত গুঁজে দিচ্ছে অবুঝ সন্তানের মুখে। আর বাচ্চাটিও কেমন পাজি নচ্ছার– ডান হাতটা বাড়িয়ে সন্ধান করছে মায়ের বুকের অপর স্তনবৃন্তটি। হয়তো বা প্রথম পোয়াতি মা, তবু তার চোখে-মুখে এতটুকু দ্বিধা নেই, শরম নেই। রবি পাল নিজেই সরে আসে সামনে থেকে। পর্দার আড়ালে সরিয়ে আনে নিজেকে। আর তখনই দৃষ্টি জুড়ে নেমে আসে সাবিত্রীর মায়ের স্মৃতি। আকাশভাঙা লজ্জা ছিল তার চোখে। প্রথম সন্তান কন্যা হওয়ায় কত না কুণ্ঠিত সে! যেন বা সমস্ত দায় তার। বুকের উষ্ণতায় লুকিয়ে রাখে কন্যাকে। একা একাই আদুরে গীত গায়– ও আমার সতী সাবিত্রীরে! তোকে কোথায় রাখি! এভাবেই নামকরণ ঘটে সাবিত্রীর। তার মা সদাসন্ত্রস্ত, মেয়েকে সর্বদা লুকিয়ে রাখে বুকের মধ্যে। শাড়ির আঁচলের আড়াল তৈরি করে শৈল্পিক কায়দায়। তারপর শিল্পিত সেই ছায়াতলে সাবিত্রীর কচিমুখে তুলে দেয় স্তনবৃন্ত। একদিন কী এক অসাবধানতায় তার বুকের শৈল্পিক পর্দা খসে পড়তেই রবি পালের দু'চোখ ভরে যায় কানায় কানায় মাতৃত্বের ছবির উদ্ভাসে। এ সব সেই কবেকার কথা। চোখের পর্দা থেকে এখনো মোছেনি সেই দৃশ্য! রবি পাল কি তাহলে এতদিন পরে পুরনো সেই ছবি খুঁজে ফিরছে? সাবিত্রীর অন্তর্ধানের মাত্র মাসখানেকের মাথায় সর্পদংশনে বিদায় নেয় তার মা। কে জানে এতদিনে সে তার সতী-সাবিত্রীকে খুঁজে পেয়েছে কিনা! না হোক দুগ্ধপোষ্য শিশু, তবু সাবিত্রীকে দেখে মাতৃবক্ষের দুগ্ধভাণ্ডার উথলে উঠতেও তো পারে! অসময়ে জোয়ার আসতে কি পারে না?

রবি পাল পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে দেবী প্রতিমার কাছে। ষষ্ঠী এসে গেছে, বোধনের আর বিশেষ বিলম্ব নেই। পর্দা উঠে যাবে দেবী উন্মোচিত হবেন সর্বসমক্ষে। তার আগে আপন সৃষ্টির সামনে এসে কুণ্ঠাহীন দৃঢ়তায় দাঁড়ায় রবি পাল। দেবী প্রতিমার মাথার চেলি থেকে পায়ের আলতা পর্যন্ত ঘোর-লাগা চোখে পর্যবেক্ষণ করে। পর্দা উন্মোচনের আগে শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নেওয়া– কোথাও কোন সংশোধনী যদি লাগে। কোথাও! কোথাও! রবি পালের দৃষ্টি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিমার সুউন্নত বক্ষদেশের উপত্যকায়। কী চমৎকার সুডৌল গড়ন! যেন-বা স্বর্গ থেকে গড়িয়ে পড়া দু'টি বাতাবি লেবু এইখানে এসে স্থির হয়েছে। এইখানে! রবি পাল তাকিয়ে দেখতে পায়, তার ডান হাত এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রতিমাবক্ষের উপত্যকায়। কিন্তু এ কী উত্তাপ তার হাতের তালুতে! আশ্চর্য! অতি দ্রুত সে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। চমকে ওঠে রবি পাল। চোখ রগড়ে ভাল করে তাকায় কে দাঁড়িয়ে তার সামনে– দেবী দুর্গা, নাকি সাবিত্রীর মা? স্বচ্ছ আলো ঠিকরে পড়ছে চোখে-মুখে, তবু কেন যে এই বিভ্রম, কে বলবে?

প্রতিমা বক্ষ থেকে নিজের ডানহাত ক্ষিপ্রভঙ্গিতে টেনে নেয় রবি পাল। নিজেকেই সে ধিক্কার দিয়ে ওঠে– এ সব কী হচ্ছে? কী মানে হয় এইসব কা-কীর্তির? সহসা রাগ চড়ে যায় মাথায়। সেই রাগ ঝাড়ে অনন্তর উপরে,

হা করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস, এ্যাঁ?

অনন্ত কোনরকমে উত্তর করে,

আপনার হাতের কাজ দেখছি কর্তা!

হাতের কাজ!

রবি পাল নিজের ডানহাতের দিকে একবার তাকায়। তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অনন্তকে আদেশ দেয়,

এক তাল কাদা নিয়ে আয় দেখি!

কাদা! সব কাজ গুটানোর পর আবার কাদা কী হবে?

বকবক করিসনি তো! যা বলছি, তাই কর। কাদা আন।

রং চং হয়ে গেছে। এখন কাদা কোথায় লাগবে?

তুই কাদা আন। আমি অসুরের গায়ে কাদা দেব। মুখে কাদা দেব।

রফিকুর রশীদ
ছোটগল্পকার

অনুবাদ গল্প

পয়সা বেঁচে গেল

বি এস রাময়্যা

চার-পাঁচটা বাড়ি ছাড়িয়ে ওই গলিটা থেকে একটা কুকুরের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। অরুণাচল মুদালিয়ারকে ঘিরে দাঁড়ানো সবার মন কেঁপে উঠছিল কুকুরটার কান্নায়। স্বল্পালোকিত ঘরে সবাই একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। বাইরের বারান্দায় অন্ধকারে বসা লোকজন ঘরের ভেতরে ও হলঘরের ভেতরের মহিলারা খুব কষ্ট করে নীরব ছিল। সবাই ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বারান্দায় বসা একজন কুকুরটাকে তাড়াবার জন্য উঠল।

অরুণাচল মুদালিয়ার যে ঘরে শোয়, সে-ঘরের জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করার চেষ্টা করছিল তাঁর ছোট ছেলে জগদীশন। অতি কষ্টে মাথাটা ঘুরিয়ে হাত নেড়ে কিছু ইশারা করলেন মুদালিয়ার। বড় ছেলে বৈদ্যলিঙ্গম আর শালা কন্দস্বামী পাশেই দাঁড়ানো। বৈদ্যলিঙ্গম জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, কি চাইছ?'

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই জানালাটা বন্ধ করছ কেন?' যদিও খুব ক্ষীণ-কণ্ঠেই বলছিলেন, তবুও কথাটা জগদীশনের কানে গেল। সে বলল, 'ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে।' বৃদ্ধ বললেন, 'তাতে ক্ষতি নেই। ওটা বন্ধ কোরো না।' অন্য একটা দরজাও খুলে দেওয়া হল।

জগদীশন চাইছিল যাতে কুকুরটার আর্ত-চীৎকার বৃদ্ধের কানে না পৌঁছয় কিন্তু বুঝল তিনি শুনেছেন। ঘরের সবাই ভীত, চিন্তিতভাবে ওঁর দিকে তাকাল। বৃদ্ধ হাঁপিয়ে উঠে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

আবার কুকুরটার সকরুণ চীৎকার ভেসে এল। পরক্ষণেই কি জানি প্রস্তরাঘাতজনিত বেদনা বা অন্য কোনও কারণে কুকুরটা আরও জোর আরও তীক্ষ্ম আওয়াজ করে পালিয়ে গেল।

এখনও অরুণাচল মুদালিয়ারের চোখ বোজা। মৃত্যুভীতির একটা বেদনার ছাপ যেন সারা মুখে। আশা আর বিশ্বাসের একটা ভাব ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছিল। সেটা যেন কুকুরের আর্তনাদে সব সময়ের জন্য মিলিয়ে গেল। মনে মনে বলছিলেন, 'সকালেই মাদ্রাজের সবচেয়ে নামী ডাক্তার এসে যাবেন। আমার আয়ু তিনি বাড়িয়ে দেবেন।' কিন্তু মন সেই ডাক্তারের কথার চেয়ে সদ্য আগত যমরাজের চিন্তায় মগ্ন। একটা কথাই ঘুরেফিরে ওঁর মনে আসছিল, 'আর বিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে না। বিশ্বাসের কথা এখন ওঠে না।'

একমাস হল মুদালিয়ার মাদ্রাজ থেকে গাঁয়ে এসেছেন। মাদ্রাজে থাকাকালেই শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। কাজ করার তাঁর অসীম ক্ষমতা ক্রমেই যেন কমে আসছিল। প্রায়ই হাঁপ ধরে বসে পড়তেন। তাঁর নিজের কাছেই সব যেন নতুন।

চুল পাকে শারীরিক কারণে– কিন্তু বৃদ্ধাবস্থা মনের ব্যাপার। আমাদের চিন্তা ভাবনা ধরন-ধারণ আমাদের সেই অবস্থারই পরিচায়ক। মন যখন যুবাবস্থায় তখন কেউই বুড়ো হয়ে যেতে পারে না। এসব কথাই উনি বলাবলি করতেন। জীবনেও তার প্রয়োগ করতেন। নিজের মনে নিজে সর্বদা বলতেন, 'বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শরীরের পরিবর্তন অবশ্যই হবে। তবে বার্ধক্যের সঙ্গে হৃদয়ের কোনও যোগ নেই।'

এ ধরনের লোকের চিন্তাপ্রবাহে বাধা পড়লে স্বভাবতই ঘাবড়ে গিয়ে এরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার জানান, 'নিজের ক্ষমতার চেয়ে বেশি কাজ করার ফল এটা। অন্য কিছু নয়। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়লে, মনেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিছুদিন বাইরে কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নিন।'

অরুণাচল মুদালিয়ার ডাক্তারের কথা মেনে নিলেন। ছেলেপিলে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে উনি কোদাইকানাল, কুদানল, নীলগিরি ইত্যাদি স্থান, এমন কি নিজের গাঁয়েও একবার ঘুরে আসা স্থির করলেন।

গ্রামে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃপুরুষের জায়গা-জমি উনি পেয়েছিলেন। স্বোপার্জিত অর্থের একাংশ দিয়েও কিছু জমি কিনে সে সম্পত্তিভুক্ত করেছিলেন। অনেকদিন থেকে মনে মনে ভেবেছিলেন যে একবার গাঁয়ে গিয়ে অন্তত ছ'মাস নিজেই জায়গা-জমির দেখাশোনা করবেন। কিন্তু মাদ্রাজে চারিদিকের সব ঝামেলা, বিশেষ করে ছড়ানো সব টাকা-পয়সা ছেড়ে বেরিয়ে আসার আর সুবিধা হয়নি।

এমন সময় ডাক্তারের এবম্বিধ পরামর্শের কারণে বহু দিনের ইচ্ছাপূরণের একটা সুযোগ মিলল। বিশ্রামের জন্য উনি গাঁয়ে গেলেন।

দুই.

অরুণাচল মুদালিয়ারের আগমনে গাঁয়ে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। সেখানকার তিনি একজন বড় জমিদার। মাদ্রাজে তাঁর বিরাট ব্যবসা। তাঁর প্রতিষ্ঠানে লাখ-লাখ টাকার কাজকর্ম হয়। মুদালিয়ার যা কিছুতে হাত ছোঁয়ান তাই সোনা হয়ে যায়। এটাই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস। শুধু তারা কেন, শহরের লোকদেরও সে ধারণা।

কিয়দংশ কথাটা সত্যি। ব্যবসা-বুদ্ধিতে মুদালিয়ার কুশলতার চরমে পৌঁছেছিলেন। চট করে সব ব্যাপার এত সহজে বুঝতে পারতেন যে গোড়াতেই সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির অঙ্কটা কষে নিতে পারতেন। এই কারণে যে কাজে লাভ, কেবল সে ধরনের কাজেই উনি হাত লাগাতেন। ক্ষতির কোনও আশংকা কিছুতে থাকলে সেদিকে এগোতেন না।

পঁচিশ বছর বয়সে মুদালিয়ার মাদ্রাজে আসেন। সেখানে ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন। দিনে দিনে উন্নতি করেছিলেন।

বছর বছর তাঁর ধনসম্পত্তি বেড়ে চলেছিল। এখন যখন গ্রামে ফিরলেন, তখন বার্ষিক এক লাখের হিসেবে তাঁর এই সম্পত্তির পরিমাণ ত্রিশ লাখ টাকার ওপর।

নিছক বিশ্রামের জন্যই তিনি গ্রামে আসেননি। ভেবেছিলেন বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে জমি-জমার ও আদায়পত্রের হিসাবটাও করতে থাকবেন। কিন্তু গাঁয়ে পৌঁছনোর দু'তিনদিন বাদেই অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তাড়াতাড়ি হয়তো মাদ্রাজে ফিরতে পারতেন, কিন্তু ক'টা দিন দেখতে চাইলেন কিন্তু পরে অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, ডাক্তার গ্রাম ছেড়ে যেতে মানা করলেন।

মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার আনা হল। বড় শখ করে মুদালিয়ার একটা বুইক গাড়ি কিনেছিলেন। ছেলে বৈদ্যলিঙ্গম নিজের জন্য নিয়েছিল আর্মস্ট্রং সিডলি। এ দুটোই এখন মাদ্রাজ আর গ্রামের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে। ডাক্তার বললেন, 'আর ঘাবড়াবার কিছু নেই। সপ্তাহকালের মধ্যে মাদ্রাজ ফিরে যেতে পারবেন।' এই আনন্দে দু'দিন সবাই খুশিতে মশগুল। এই খুশিই আবার উবে গেল যখন তৃতীয় দিনে ডাক্তার জানালেন, 'অন্তত পনেরো দিন আপনার বেশি কথাবার্তা বলা চলবে না।'

গত দু'দিন ধরে সবারই ভরসা কমে আসছিল। সবারই মনে হল যে মাদ্রাজ থেকে নামী কোন ডাক্তার আনা প্রয়োজন। ভাবল, মোটরে আসতে সময় বেশি লাগলে, পে-ন্স এসে তিন মাইল দূরে নেমে, এ বাড়ি পর্যন্ত গাড়িতেই চলে আসা যায়। পরের দিন সকালেই পে-ন্স ডাক্তার এসে পৌঁছচ্ছেন।

কুকুরের আর্তনাদ যেন জানিয়ে দিল যে ওঁর আসার আগেই যমরাজ এসে যাচ্ছেন। মুদালিয়ারের চিন্তা দ্রুততর হল। বার বার মনে তাঁর এ ভাবনাই উঁকি দিল 'বিশ্বাসের আর ব্যাপার নয়। বিশ্বাসের কোন স্থান নেই আর।'

তিন.

গোড়ায় গোড়ায় ব্যবসায়ী জীবনের শুরুতে মুদালিয়ার পুরো ভগবৎ বিশ্বাসী ছিলেন। পরে নাস্তিত্বক হয়ে পড়েন। মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানের কথা চিন্তা করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। কিভাবে যেন ভগবান শব্দটাই তাঁর ভাবনারহিত হয়ে ছিটকে চলে যায়। তবে বাড়িতে পালা-পার্বণে, উৎসবাদিতে পূজা হলে তাতে অংশগ্রহণ করতেন। বাইরে দান-ধ্যান, ধর্ম বা ভগবানসংক্রান্ত কর্মে টাকা-পয়সাও দিতেন কিন্তু মন কখনও সে-দিকে ধাবিত হয়নি।

তবে নিজে কোনও যুক্তি-তর্ক, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এই ধারণায় আসেননি। অর্থ যে শক্তির আধার সে-কথাটি সারা মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। অন্যান্য ধারণাও সে কারণে মন থেকে অন্তর্হিত হচ্ছিল। নিজেও বুঝতে পারেননি।

গ্রামে আসার পর ওর শরীরের অবস্থা যখন উদ্বেগজনক হয়ে উঠল, তখন পয়সা-কড়িসম্পর্কিত কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা তাঁর মনে এসে বার বার উঁকি দিতে লাগল। একটা চিন্তাই ঘুরে ফিরে আসতে লাগল যে তাঁর মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তির কি গতি হবে। এটাও বুঝলেন যে, এ ব্যাপারে সত্বর একটা কিছু করা দরকার। ছেলেকে ডেকে এ বিষয়ে বললেন। ওর শালা কন্দস্বামী মুদালিয়ার বলল, 'এসব চিন্তা এখন করছেন কেন? আমরা মাদ্রাজ থেকে নামকরা ডাক্তারকে আনাচ্ছি। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা মাদ্রাজ চলে যাব। তখন চিন্তা করা যাবে।' এসব কথা শুনে মনটা হালকা হল, নিজের মৃত্যুর পর ধন সম্পত্তির বণ্টন কি ভাবে হবে সে নিয়ে তাঁর ভাবনা হচ্ছিল, যখন এরা বলল যে বাঁটোয়ারার কথা এক্ষুণি ভাবার প্রয়োজন নেই, তখন তাঁর মনে হল যে অন্য বিষয়ে চিন্তাও আপাতত নিষ্প্রয়োজন। এরা দৃঢ়তার সঙ্গেই জানিয়েছে যে এসব কথার পর পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যা করণীয়, তাও অবশ্যই এরা করবে।

কুকুরটার আর্তনাদ শুনে এটা তিনি বুঝলেন যে নিজের ইচ্ছার সুনিশ্চিত রূপায়ণের অবকাশ আর তাঁর হবে না। মুদালিয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। হৃদয়ঙ্গম করলেন যে এজন্মে পুজো-আরাধনা যতটুকু যা করা

চোখ খুললেন তিনি। দেখলেন সামনে কন্দস্বামী মুদালিয়ার, তার স্ত্রী-বাচ্চারা সব চিন্তান্বিতভাবে তাঁর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে দেখছে। কন্দস্বামী মুদালিয়ারের দিকে তাকিয়ে তিনি ঠোঁট নাড়লেন। কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। কন্দস্বামী মুদালিয়ার ঝুঁকে পড়ে নিজের কান মুদালিয়ারের ঠোঁটের কাছে নিল। অরুণাচল মুদালিয়ার বললেন, 'আমার চেক বইটা দাও।' তারপর উনি আবার চোখ বন্ধ করলেন।

উচিত ছিল সেটা না করে জীবনের কাজ শেষ করায় কোনওভাবে তৎপর হওয়া খুবই অন্যায়। নিজের অন্তর্যামীই তাঁকে একথা বলেছেন। বিড় বিড় করে তিনি বলে উঠলেন, 'প্রভু, কেবল একটা অবকাশ আমায় দাও।' বললেন, 'এর দরুন যা-কিছু মূল্য তুমি চাইবে, তাই দেব আমি। এই ধন-সম্পত্তি যা আমি অর্জন করেছি, তা থেকে যত লাখ টাকা তুমি চাও, তাই দেব।' ভগবানের সাড়া পাওয়া গেল না। কুকুরটা জানিয়ে দিল যে যমরাজ গাঁয়ের সীমানায় এসে গেছেন। ঘুরে ফিরে এই একটা কথাই তাঁর মনে উঁকি দিতে লাগল।

এক লাফে তাঁর মন যমরাজের দরবারে পৌঁছে গেল। 'কেবল একটা বছর সময় দাও। তার ভেতর যা কিছু করা দরকার, আমি করে নেব। ভগবানকে ডাকবার জন্য আমার এক বছর সময় যথেষ্ট।' কথাটা ভেবে নিয়ে ভগবানের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনার উত্তর কিছু মিলল না।

'এসে তো গেল! খালি হাতে ফিরেও যাবে না। আমার বদলে অন্য কাউকে নিয়ে যেতে রাজী হও তো– তাহলে আর খালি হাতে ফিরে যেতে হবে না। যদি তেমন যাওয়ার জন্য অন্য কেউ তৈরি থাকে তবে তার পরিবারকে দু'লাখ টাকা দেব আমি।' এধরনের সব কথা তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল।

চোখ খুললেন তিনি। দেখলেন সামনে কন্দস্বামী মুদালিয়ার, তাঁর স্ত্রী-বাচ্চারা সব চিন্তান্বিতভাবে তাঁর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে দেখছে। কন্দস্বামী মুদালিয়ারের দিকে তাকিয়ে তিনি ঠোঁট নাড়লেন কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। কন্দস্বামী মুদালিয়ার ঝুঁকে পড়ে নিজের কান মুদালিয়ারের ঠোঁটের কাছে নিল।

অরুণাচল মুদালিয়ার বললেন, 'আমার চেক বইটা দাও।' তারপর উনি আবার চোখ বন্ধ করলেন।

মিনিট পাঁচেক পার হয়েছে। মুদালিয়ারের যেন মনে হল গ্রামের ডাক্তার এসে তাঁর নাড়ী টিপে দেখছেন। ডাক্তারের চোখে-মুখে একটা প্রশ্নচিহ্ন ফুটে উঠছে কেন? জগদীশন ঘাবড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ওঁকে যেন কি জিজ্ঞাসা করছে না?

ডাক্তার একটা ইনজেকশন দিলেন। ওর মনে হল বাঁ হাত হয়ে হৃদয় পর্যন্ত সেটা দপদপিয়ে চলে যাচ্ছে। দেখ, দেখ যেন হৃদয়ের গভীরতম প্রান্তে গিয়ে সেটা পৌঁছেছে। সেখান থেকে আবার বেরিয়ে যেন সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

মুদালিয়ার কিছুটা শক্তিলাভ করলেন। ডাক্তার আবার নাড়ী টিপলেন। উনি বললেন, 'এক ঘণ্টা এভাবে থাকতে দিন। আমার জন্য বারান্দায় একটা আরাম কেদারা বিছিয়ে দিতে বলুন। আবার আরেকটা ইনজেকশন দিতে হবে।'

কন্দস্বামী মুদালিয়ার চেক বই নিয়ে এল। সে বলল, 'ডাক্তারবাবু, উনি আমায় চেক বইটা আনতে বলেছেন।'

'এখন রেখে দিন। আবার উঠে যদি চান তখন দেখা যাবে। গোলমাল করলে আবার দুর্বলতা বাড়বে'– এ কথা বলে ডাক্তার বাইরে চলে এলেন।

অরুণাচল মুদালিয়ার চোখ বোজা রেখেই এসব কাজকর্ম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অবলোকন করতে লাগলেন।

'ইনজেকশনের ফলে নাড়ীতে বলসঞ্চার হয়েছে। আমার তো তাই মনে হচ্ছে...। যমরাজের আসতে আরও একঘণ্টা দেরি। আবার আর একটা ইনজেকশন আবার আরও একঘণ্টা পাওয়া যাবে। এভাবে কাল পর্যন্ত... তারপরেই বড় ডাক্তার এসে যাবেন উড়ো জাহাজে– নইলে তো সবই ভেস্তে যাবে। ইনজেকশনের ভরসায় আমি থাকতে পারি না। এই ইনজেকশন দিয়ে যমরাজের সামনাসামনি হওয়া কি সম্ভব? আমার জন্য প্রাণ দিতে কেউ প্রস্তুত থাকলে, তার পরিবারকে একটা চেক দিয়ে দেব... আমার শালাকে কথাটা বলে দিলেই যথেষ্ট হবে।'

অরুণাচল মুদালিয়ারের ঠোঁটটা একটু কেঁপে উঠল। চোখ বোজাই ছিল। আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। জগদীশন কাছে এসে ঝুঁকে কথা শোনার চেষ্টা করল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সে মামাকে বলল, 'কি জানি কি দু'লাখ টাকার কথা বলছেন। উৎকণ্ঠাভরে সে দাঁড়িয়ে রইল যদি মুদালিয়ারের ঠোঁট আবার নড়ে কিন্তু সেটা আর নড়ল না।

অরুণাচল মুদালিয়ারের শরীর আর স্ব-বশে ছিল না। তবে এটুকু উনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে শরীর ইচ্ছামত এপাশ-ওপাশ করার ক্ষমতা আর তাঁর নেই।

তাঁর মনে হল একঘণ্টা বাদের সেই দ্বিতীয় ইনজেকশনটা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবারই তাঁর যেন মনে হচ্ছিল যে ওষুধের প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও যেন শরীরের ওপর তাঁর নিজের বশ কিছুই থাকছে না।

দ্বিতীয় দফায় সুঁচের মুখে শরীরে ওষুধটা ছড়িয়ে যাবার পর নাড়ী দেখে ডাক্তার বললেন, 'নাড়ীর গতি পুরোপুরি ঠিক হয়ে এসেছে। এখন আর ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। তবুও আমি বাইরে বসে রইলাম।' ডাক্তারের কথা স্পষ্টভাবেই সব ওর কানে পৌঁছল।

এর পরে ঘরে আর কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। দু-একবার কারো খুব ধীর পদক্ষেপে আসা-যাওয়ার শব্দ একটু কানে এল। ফিসফিস কথাবার্তাও একটু শোনা গেল, 'আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি এখন থাকছি।'

নিস্তব্ধতায় ঘরটা ছেয়ে গেল। কতক্ষণ যে এই নিস্তব্ধ ভাবটা ছিল সেটা বোঝা গেল না। রাতের এই স্তব্ধতা ভেদ করে হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল, 'হায় রে, হায়, এই এসে গেছে।' আরও অনেক চীৎকার ভেসে এল। কিন্তু মুদালিয়ার সে সব আর শুনতে পেলেন না।

'এই এসে গেছে। কে? এখানে? আমার বদলে অন্য কারো ব্যবস্থা হয়ে গেছে? আমি কন্দস্বামী মুদালিয়ারকে বলে দিয়েছি দু'লাখ টাকা দিয়ে দেবার জন্য। লোক তবে পাওয়া গেছে? কিন্তু একথা বোধহয় আমি বলে দিইনি যে

দ্বিতীয় দফায় সুঁচের মুখে শরীরে ওষুধটা ছড়িয়ে যাবার পর নাড়ী দেখে ডাক্তার বললেন, 'নাড়ীর গতি পুরোপুরি ঠিক হয়ে এসেছে। এখন আর ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। তবুও আমি বাইরে বসে রইলাম।' ডাক্তারের কথা স্পষ্টভাবেই সব ওর কানে পৌঁছল। এর পরে ঘরে আর কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। দু-একবার কারো খুব ধীর পদক্ষেপে আসা যাওয়ার শব্দ একটু কানে এল।

দূরাগত ভয়ানক চীৎকার-চেঁচামেচিতে খেই হারিয়ে গেল। মনে মনে চিন্তাটা বাদ দিয়ে দূরের শব্দ কোলাহল শুনে ব্যাপারটা তিনি বুঝে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। গলিতে অনেক লোক দৌড়চ্ছিল। কি জানি কি বলে ওরা চীৎকার করছে। বাড়িতেও লোক দৌড়াদৌড়ি করছে। যে ঘরে উনি শুয়েছিলেন সেখানেও লোক চলাফেরা করছিল। কিন্তু উনি স্পষ্ট কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। তিনি অনুভব করলেন যে শরীর আর তাঁর বশে নেই।

যদি ও টাকায় রাজী না হয় তবে তার চেয়ে বেশি দিতে পেছপা হোয়ো না। দিয়ে দিয়ো। আর ওই ওখানে চেঁচামেচি কিসের শোনা যাচ্ছে? যমরাজের পদধ্বনি? খোকা, মামাকে বল। লোক কি পাওয়া গেছে? বলেছ কি একটা দু'লাখ টাকার চেক দিচ্ছি? ডাক্তারবাবু, নাড়ীর গতি কি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে? তা হলে এক বছরই যথেষ্ট। আমার বদলে একজনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ওর পরিবারকে দু'লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে।'

কাবেরী নদীর জলের ঘূর্ণির মত মুদালিয়ারের মন দ্রুত পাক খেতে লাগল। একই চিন্তা থেকে থেকে তাঁর মনে ঘুরপাক খেতে লাগল... দু'লাখ টাকা... আমার বদলে আরেকজন... এক বছর সময়।'

দূরাগত ভয়ানক চীৎকার-চেঁচামেচিতে খেই হারিয়ে গেল। মনে মনে চিন্তাটা বাদ দিয়ে দূরের শব্দ কোলাহল শুনে ব্যাপারটা তিনি বুঝে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। গলিতে অনেক লোক দৌড়চ্ছিল। কি জানি কি বলে ওরা চীৎকার করছে। বাড়িতেও লোক দৌড়াদৌড়ি করছে। যে ঘরে উনি শুয়েছিলেন সেখানেও লোক চলাফেরা করছিল। কিন্তু উনি স্পষ্ট কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। তিনি অনুভব করলেন যে শরীর আর তাঁর বশে নেই। ভাবলেন সম্ভবত শারীরিক ক্রিয়া-কর্ম লুপ্ত হবার আগে এমনই হয়।

গলিতে কথাবার্তা শোনা গেল। বক্তার কথা বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। মুদালিয়ার উৎকণ্ঠাভরে ওই কথা শোনার ও তার মর্ম উদ্ধারে মন দিলেন।

মুনিরত্নম নাইডুর বাড়িতে চোর এসেছিল। সে সময় নাইডু বাড়িতে ছিলেন না। কেবল স্ত্রী ও বাচ্চারা। যখন চোর ভেতরে ঢুকে অলংকারের বাক্স খোলার চেষ্টা করছিল, তখন নাইডু-পত্নীর ঘুম ভেঙে যায় এবং চীৎকার করে ওঠে, 'হায় রে, চোর এসেছে'। চোরদের একজন ছোরা দেখিয়ে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করে। অন্যেরা বাক্স নিয়ে চলে যায়।

ওর চীৎকার শুনে আশেপাশের লোকজনেরা চারিদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তাই লোকেরা কিছু করে উঠতে পারছে না।

দক্ষিণ দিকের গলির কিছু লোক চীৎকার শুনে দৌড়ে আসে। নাইডুর বড় বোনের বাড়ি ঠিক পিছনেই। তাই নাইডুর বড় দিদির ছেলে বেঙ্কটস্বামী বাড়ির পিছন দিক থেকে পড়ি-মরি হয়ে ছুটে আসে।

এসময় নাইডুর স্ত্রীকে ছোরা দেখিয়ে লোকটা দেওয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করছিল। বেঙ্কটস্বামী লাফিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলল। ভেঙ্কটস্বামীর চিৎকারে আরও কিছু লোক দৌড়ে সেদিকে আসে। ওদিকে আরও লোককে আসতে দেখে চোরটা বেঙ্কটস্বামীকে ছোরার আঘাত করে পালিয়ে গেল। সবাই গিয়ে চোরের পেছনে ধাওয়া করা সত্ত্বেও সে পালাল।

'ছোরাটা বেঙ্কটস্বামীর বুকের মধ্যে দু'ইঞ্চি ঢুকে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। সবাই বলছে ছেলেটাকে বাঁচানো কঠিন হবে।' এ পর্যন্ত বলে বক্তা থামল।

অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি ছেলেটিকে দেখেছেন। বেঁচে যাবে তো?'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ওখানে পৌঁছনোর আগেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ছোরাতে তার হৃৎপিণ্ড টুকরো হয়ে গেছে।'

তৃতীয়জন বলল, 'ও মরে গেল? হায় বেচারা। গত মাসেই তার বিয়ে হয়েছে। খুবই ভাল ছিল ছেলেটা। আর খুব সেয়ানা। ধৈর্যও ছিল খুব...। আমায় বলেছিল 'আমি পুলিশে চাকরির জন্য দরখাস্ত দিচ্ছি।' ইন্সপেক্টরের কাজ সে সহজেই পেতে পারত।'

মুদালিয়ারের মনে হল তাঁর নতুন করে বল সঞ্চার হচ্ছে। চিন্তাধারা নতুন খাতে আরও দ্রুতবেগে বইছে। মনে মনে বলল, 'ভালই হল!' কুকুরটা তবে আমার জন্য চেঁচাচ্ছিল না। যমরাজ এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমার জন্য নয়। মুনিরত্নম নাইডুর বাড়ির পেছনের লোককে দেখে কুকুরটা চেঁচিয়েছিল। আমার কথা হয়তো ভাবেওনি।'

উনি চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। কি আশ্চর্যের কথা! চোখ খুলে গেল। কথাও খুব স্পষ্ট শোনা গেল। ওর শালা আর দুই ছেলে পালঙ্কের পাশে দাঁড়ানো।

'ঘাম হচ্ছে', বলে জগদীশন বাবার মাথার ঘামটা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল।

মুদালিয়ার শালাকে বললেন, 'চেকটা ছিঁড়ে ফেলে দাও।'

শালা বলল, 'আপনার সেই চেক তো এখনও কাটা হয়নি। আপনি শুধু আমায় চেক বইটা আনতে বলেছিলেন।'

অরুণাচল মুদালিয়ার মাঝখানে বলে উঠলেন, 'এখনও লেখনি চেক? তা হলে চেক বইটা ভেতরে নিয়ে রেখে দাও।'

ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এমন কোনও কাজে উনি কখনওই হাত দেননি।

অনুবাদ **অজিতকুমার দত্ত**

মুদালিয়ারের মনে হল তাঁর নতুন করে বল সঞ্চার হচ্ছে। চিন্তাধারা নতুন খাতে আরও দ্রুতবেগে বইছে। মনে মনে বলল, 'ভালই হল!' কুকুরটা তবে আমার জন্য চেঁচাচ্ছিল না। যমরাজ এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমার জন্য নয়। মুনিরত্নম নাইডুর বাড়ির পেছনের লোককে দেখে কুকুরটা চেঁচিয়েছিল। আমার কথা হয়তো ভাবেওনি।'

লেখক পরিচিতি

বি এস রামায়্যার জন্ম ১৯০৫ সালে। লবণ সত্যাগ্রহের জন্যে কারাবরণকারী এই লেখক গল্প ছাড়াও নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত। চলচ্চিত্রের জন্যও কাজ করেছেন। ১৯৩৩ সালে *আনন্দ বিক্রান্ত* পত্রিকায় 'মালাকম মালামুন' (ফুল ও সৌরভ) নামে গল্প লিখে তৃতীয় স্থান অর্জনের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি। প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'মণিকোডি'র সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহিত্য রচনা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তামিলনাড়ুর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের অন্যতম এই লেখকের ছোটগল্প *আনন্দ বিক্রান্ত, কল্কি, কুমুদম, দিনমণি, গান্ধী, জেয়াকডি* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনশতাধিক ছোটগল্পের জনক বি এস রামায়্যা ১৯৮২ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

শেষ পাতা

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লায়। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের নতুন কাব্যরীতির সূচনাকারী কবি হিসেবে সমাদৃত বুদ্ধদেব অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করেছেন, ছেলে জুটিয়ে নাটকের দল তৈরি করেছেন। *প্রগতি* ও *কল্লোল* নামে দু'টি পত্রিকায় লেখার অভিজ্ঞতা সম্বল করে যে ক'জন তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রভাবের বাইরে সরে দাঁড়াবার দুঃসাহস করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

তাঁর বাবা ভূদেব বসু ছিলেন পেশায় উকিল। মায়ের নাম বিনয়কুমারী। মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ছিলেন পুলিশ অফিসার। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের মালখানগর গ্রামে। তাঁর জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বিনয়কুমারীর মৃত্যু ঘটে। এতে শোকাভিভূত হয়ে তাঁর বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। মাতামহ্লমাতামহীর কা ছে প্রতিপালিত বুদ্ধদেবের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমভাগ কাটে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলায়।

১৯২১ সালে তিনি ঢাকায় আসেন এবং প্রায় দশ বছর ঢাকায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন– '২৫ সালে ঐ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান এবং '২৭ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে ঢাকা কলেজ) থেকে আইএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৩০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক সম্মান ও '৩১এ প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। স্নাতক পরীক্ষায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বরের রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেননি।

ঢাকায় শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৩১ সালে তিনি কলকাতায় যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৩৪ সালে প্রতিভা সোমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন– উত্তরকালে যিনি প্রতিভা বসু নামে লেখকখ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপনা দিয়ে বুদ্ধদেবের কর্মজীবনের শুরু। জীবনের শেষাবধি নানা কাজেকর্মে যুক্ত থাকলেও শিক্ষকতাই ছিল তাঁর মূল জীবিকা। ইংরেজি সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য পরিণত বয়সে তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলাভাষার তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষীণস্রোতকে তিনি বিস্তৃত ও বেগবান করে তোলেন। ১৯৩৪ '৪৫ সাল পর্যন্ত কলকাতার রিপন কলেজে অধ্যাপনা করেন। বছরছয়েক *স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকায় সাংবাদিকতার পর '৫২ সালে দিলিস্ন ও মহীশূরে ইউনেস্কোর প্রকল্প উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পিটস্‌বার্গের *পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেনে* শিক্ষকতা করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ '৬৩ সাল পর্যন্ত তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি অজিত দত্তের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় ১৯২৯ '২৯ পর্যন্ত *প্রগতি* নামে মাসিক পত্রিকা বের করেন। এসময় *কল্লোল*গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কলকাতায় বাসকালে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় ত্রৈমাসিক *কবিতা* পত্রিকা (১৯৩৫) প্রকাশ করেন। পঁচিশ বছরেরও অধিককাল তিনি পত্রিকাটির ১০৪টি সংখ্যা সম্পাদনা করে আধুনিক কাব্যআ ন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁর অনুপ্রেরণা, সদিচ্ছা, অনুশাসন ও নিয়ন্ত্রণে বাংলা কবিতা আধুনিক রূপ লাভ করে। ১৯৩৮ সালে হুমায়ূন কবিরের সঙ্গে ত্রৈমাসিক *চতুরঙ্গ* সম্পাদনা করেন।

বুদ্ধদেবের গদ্য ও পদ্যের রচনাশৈলী স্বতন্ত্র ও মনোজ্ঞ। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্যধারার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কবিতার পাশাপাশি গদ্যশিল্পী হিসেবেও তিনি সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় দেন। সমালোচন্মসাহিত্য রচনায়ও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বাংলা গদ্যরীতিতে ইংরেজি বাক্যগঠনের ভঙ্গি গ্রথিত করে তিনি বাংলাকে অধিকতর সাবলীল করে তোলেন। তাঁর সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে অধ্যায়কে বলা হয় 'কল্লোল যুগ' সেই অধ্যায়ের তরুণতম প্রতিনিধি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে যখন *কল্লোল* প্রকাশিত হয় তখন বুদ্ধদেবের বয়স মাত্র পনেরো। কলকাতায় *কল্লোল* (১৩৩০) এবং *কালিকলম্ল*এর (১৩১৩) মত ঢাকায় *প্রগতি* ছিল সে যুগের আধুনিকতার মুখ্য বার্তাবহ। গ্রন্থকার হিসেবে বুদ্ধদেবের জীবনে ১৯৩০ সালটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরেই তাঁর *বন্দীর বন্দনা* (কাব্য), *সাড়া* (উপন্যাস), *অভিনয় নয়* (ছোটগল্প সংকলন) প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সবেমাত্র একুশ বছর অতিক্রম করেছেন।'

তাঁর প্রথম যৌবনের *সাড়া* এবং প্রাক্ল প্রৌঢ় বয়সের *তিথিডোর* উপন্যাস দু'টি দুই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট। তাঁর চলিস্নশোর্ধ বয়সের রচনায় গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত নানা চিরায়ত সাহিত্যের উপমার প্রাচুর্য দেখা যায়। তাঁর উপন্যাস যে ঘাত্লপ্রতিঘাত ও মানবিক প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, তাতে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের চেয়ে কাব্যোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য বেশি। *অকর্মণ্য, রডোডেনড্রেনগুচ্ছ, যেদিন ফুটল কমল* প্রভৃতি উপন্যাসে বুদ্ধদেব কাব্যপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। *তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর, শেষ পাণ্ডুলিপি* ইত্যাদি উপন্যাস নতুন জীবনসমীক্ষার স্বাক্ষর। *পৃথিবীর প্রতি* (১৯৩৩) ও *বন্দীর বন্দনা* উভয় কাব্যগ্রন্থেই শরীরী প্রেমের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে; কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় *কঙ্কাবতী* (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থে। পদ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে ধ্বন্নিআবর্ত নির্মাণ করে বুদ্ধদেব বসু যৌবনের আনন্দগানকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন আধুনিক কবিকুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, নাটক, কাব্যনাটক, অনুবাদ, সম্পাদনা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, শিশুসাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫৬। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পত্তনে যে ক'জনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়, বুদ্ধদেব তাঁদের অন্যতম। কলকাতায় তাঁর বাড়ির নাম *কবিতাভবন*– যা হয়ে ওঠে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তীর্থস্থান। জীবনের শেষভাগে তিনি নাট্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী, কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ, পুনর্মিলন, অনামী অঙ্গনা* ও *প্রথম পার্থ* প্রভৃতি নাট্যকাব্য বাংলা সাহিত্যে এক নতুন শিল্পরূপের জন্ম দিয়েছে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
সময় সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

৭, ২১ ও ২২ নভেম্বর ২০১৪ যথাক্রমে ওয়াকিল আহাদের বাউল সঙ্গীত, সৈয়দ আবদুল হাদীর আধুনিক গান এবং শাইলা তাসমীনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন

১৮, ২৫ ও ৩১ অক্টোবর ২০১৪ যথাক্রমে ড. নাশিদ কামালের নজরুল সঙ্গীত, ছায়া রানী কর্মকারের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ফকির আলমগীরের গণসঙ্গীত পরিবেশন

২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ যথাক্রমে ভারতের সৌমেন অধিকারীর কণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান পরিবেশন

আবৃত্তিসন্ধ্যায় সামিউল ইসলাম পোলাক, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও ডালিয়া আহমেদের কবিতা আবৃত্তি

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra November 2014

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

হেল্পলাইনসমূহ: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উল্লেখ করতে হবে–
  - ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  - ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  - ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  - ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত